জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রাঙ্কনে বাংলার মেয়ে

ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাসানাল
কলিকাতা

স্বর্গত পিতা প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

মাতা শ্রীমতী প্রমীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পাদপদ্মে

Janaki Kumar Bandopadhyaya

Chitrankane Banglar Meye

Rs. 6·50

পরিচায়িকা

"চিত্রাঙ্কনে বাংলার মেয়ে" বইয়ে লেখক জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে সব শিল্পীর জীবনী ও মতবাদ সঙ্কলন করেছেন তাতে অনেকেই সুন্দর ও সত্যের ব্যাখ্যা যে ভাবে দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ খণ্ডন করা চলেনা, কিন্তু সুন্দর কাকে বলে ও কোন মাপকাঠির দ্বারা সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করা চলে আজকেও তা জানা যায়নি। মোটকথা সুন্দর বা অসুন্দরের বিচারে আমরা ব্যক্তিগত মত বলে যা প্রকাশ করে থাকি তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফ্যাশন ও সংস্কারের ছাঁচে ফেলা অভিমত। এখানে আবেষ্টনিক কথা ওঠে যার প্রভাব রুচিকে তৈরি করে দেয়, সুতরাং যাকে আমরা ব্যক্তিগত রুচি বলি এবং নিজস্ব বিচার বলে দাবী করে থাকি তা বহুক্ষেত্রে শেখান উক্তির পুনরাবৃত্তি!

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে নানা আদর্শের অনুসরণে যে সব মতবাদ গড়ে উঠেছে বা উঠছে তা ফ্যাশনের প্রভাবমুক্ত নয় সুতরাং ভাল মন্দের বিচার করার অধিকার যদি কিছু থাকে তা Standard-এর তুলনামূলক বিচারের উপর যে Standard আপন অস্তিত্বের স্বীকৃতি দাবী করে। সেই আদর্শকে দীর্ঘকালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। নানা ঝঞ্ঝাটকে মুখোমুখি দেখার পর সংগ্রামে জয়ী হয়ে উঠতে হয়েছে। এই সংগ্রামের সাফল্য থেকে যা পাওয়া যায় তা Traditional আদর্শ। আমি Tradition মানি। সংগ্রামের মাঝে আমাকে নানা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে। জয়ী হয়েছি এমন কথা বলি না তবে বুঝেছি শিল্পীকে বাঁচতে হলে, সুন্দরকে চেনার অধিকার পেতে হলে একমাত্র প্রয়োজন সংগ্রাম। যে সংগ্রাম জীবনের সুখ দুঃখের কথা শিল্পীকে জানিয়ে দেয়, যে সংগ্রাম বীভৎস ও ভয়ঙ্করের মাঝেও সুন্দরকে দেখাতে পারে।

ডাস্টবিন পূতিগন্ধযুক্ত ব্যাধির আকর, তার মধ্যেও সুন্দর থাকে, যে সুন্দর মন্দিরের মাঝে ধূপ-ধুনাযুক্ত সুগন্ধেভরা চন্দনে লেপন দেওয়া দেবতাও বলতে পারেন না, তুমি তফাৎ যাও, তুমি অস্পৃশ্য, তুমি নোংরা কারণ যখনই আমরা বিচার করি তখনই পরিবেশকে বর্জন করা চলে না। সুতরাং ডাস্টবিনের ভূষণ ও প্রধান গুণ তার ভীতিপ্রদ দৃশ্য, ভীতিপ্রদ আকর ও দুর্গন্ধ। এই দৃষ্টান্তে প্রমান করতে চাইলাম যে, বীভৎসের মধ্যেও সুন্দর থাকে

ভয়ঙ্করের মধ্যেও সুন্দরকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাহলে নরমুণ্ড-মালিনী কালী করালীর শক্তির চরম পরিকল্পনাকে আমরা পূজা করতাম না। এগুলি নিরবিচ্ছিন্ন আমার নিজস্ব মতবাদ। মতভেদ থাকা অস্বাভাবিক নয়।

এই প্রসঙ্গে জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশংসা না করে পারছি না, কারণ কেবল পত্রপত্রিকা দেখে, সংগৃহীত ছবি দেখে শিল্পীদের দ্বারে দ্বারে তিনি ঘুরেছেন তাঁদের মতামত সংগ্রহের জন্য। যাঁদের কাছে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নামকরা শিল্পীরও অভাব নেই। এমনকি Abstract ধরণের আর্ট নিয়ে যাঁরা সাধনায় লিপ্ত আছেন এবং অন্ধ অনুকরণের তৃপ্তিতে যাঁরা মশগুল হয়ে ওঠেননি তাঁদের মতামতও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। অধ্যবসায়কে অসাধারণের কোটায় ফেলে জানকীকুমারকে শিল্পীদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই।

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপলক্ষ্য করে আরো বলতে হচ্ছে যে তিনি যেন অন্য শিল্প সমালোচকদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকেন। আমি সেইসব সমালোচকদের কথা ভেবেই বলছি যারা ছবি না দেখে ছবির গুণাগুণ নিশ্চিন্ত মনেই লিখে থাকেন এবং সেইসব মতামত বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য, সঙ্গীত বা খেলাধূলায় মেয়েদের নিয়ে অনেক কিছু লেখা হলেও চিত্রশিল্পে মেয়েদের অবদান সম্পর্কে আজো পর্যন্ত তেমন কিছু বলা হয়নি। জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সে অভাব পূরণ করলেন। পরিশেষে কামনা করি, 'চিত্রাঙ্কনে বাংলার মেয়ে' বইটি সমাদর লাভ করুক এবং লেখকের পরিশ্রম সার্থক হোক।

কলকাতা — দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

লেখকের কথা

জীবনের সঙ্গে আর্টের এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। মানুষের গভীরতর ভাবনা-চিন্তার, সুন্দর কল্পনার পল্লবিত প্রকাশ যে আর্টের মাধ্যমে হয়ে এসেছে, সে ইতিহাসের ভাস্বর রূপ পেয়েছে অজন্তা, ইলোরা, কোণারক মন্দিরের গায়ে। আশ্চর্য এক ভাস্কর্য ও অঙ্কন প্রতিভার নিদর্শন আজো বিদ্যমান খাজুরাহো, বরভুদর, সারনাথ, সাঁচি, অমরাবতীর শিল্পে,—দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে মন্দিরে,—বৌদ্ধ ও মোগল আর্টের বিকাশে ও স্বকীয়তায়। রামায়ণ মহাভারতেও এ শিল্পের উল্লেখ আছে। ঐতিহ্যময় গ্রীক্—রোমান-মিশরীয় ভাস্কর্যে ও শিল্পে বিশ্ব আজ সমৃদ্ধ। চীনের কনফুসিয়াস অঙ্কন শিল্পের একজন প্রখ্যাত উদ্গাতা।

প্রাচীন কাল থেকে যে কোন রকম ছোটবড় পূজাপার্বনে ও উৎসবে ঘরের চৌকাঠে ও মেঝে, পিঁড়ি ও ঘটে বাড়ীর মেয়েদের আলপনা দেওয়ার রীতি চলে আসছে। অনার্য ও দ্রাবিড় যুগ থেকে ভারতের আদিবাসীদের (সাঁওতাল, কোল, ভীল, ওঁরাও, মুণ্ডা, নাগা, কুকি প্রভৃতি) মধ্যে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এক আশ্চর্য ও সুন্দর শিল্পবোধ। ওদের বাড়ীর দেয়াল ও আঙিনা কত রঙকেই না ধরে রাখে—চিত্রিত করে। এসবে মেয়েদের ভূমিকাই মুখ্য।

আজ বাংলা দেশের মেয়েরা কোন কিছুতে পিছিয়ে নেই। সংসারের শতকর্মের ফাঁকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করেও তাঁরা যে শিক্ষা, সঙ্গীত, অভিনয় ও খেলাধূলার মত চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পের গৌরবও দিনে দিনে উন্নত করেছেন এ বইয়ে তা' তুলে ধরতে চেয়েছি। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি এ বইয়ে আমি কোন দর্শন, ইতিহাস বা তত্ত্বকথা বলতে চাইনি। আজ যে মেয়ে শিল্পীদের রচনাসম্ভার, অঙ্কন পদ্ধতি ও রীতি সমালোচক ও দর্শকবৃন্দ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত তার তেমন প্রচার আজো হয়নি। কারণ কিছুটা মেয়েদের সহজাত প্রচারবিমুখতা ও কতকটা শিল্পরচনার অবমূল্যায়ন। সে কথা ভেবেই 'চিত্রাঙ্কনে বাংলার মেয়ে' বইতে মহিলা শিল্পীদের কথা লিপিবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছি। আরো বহু খ্যাতিমান শিল্পী আছেন যাঁদের সম্বন্ধেও আমার লেখা উচিত ছিল কিন্তু যোগাযোগের অভাবে

তা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। আবার এমনও অনেক আছেন পাদপ্রদীপের আলোয় যাদের মুখ আজো হয়তো দেখা যায়নি, কিন্তু অনতিকালের মধ্যে তাঁরা একে একে দেখা দেবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। ইচ্ছে আছে, পরবর্তী খণ্ডে ঐ সব শিল্পীর জীবনকথা তুলে ধরার।

এ বইয়ের শান্তা দেবী, সুখলতা রাও, গৌরী ভঞ্জ ও যমুনা সেন সম্বন্ধে জীবনীগুলি বর্ষীয়ান শিল্পী হাসিরাশি দেবী কর্তৃক গৃহীত। তাঁর কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। লেখাগুলি পূর্বে 'মাসিক বসুমতী,' 'দৈনিক বসুমতী' ও 'ঘরনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সব চিত্রশিল্পীদের সম্বন্ধে লিখতে সবচাইতে বেশী উৎসাহ দিয়েছেন বসুমতীর ৺প্রাণতোষ ঘটক ও শান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সাপ্তাহিক বসুমতীর বিজন সেনের নিকটও আমি সাহায্য পেয়েছি। প্রথিতযশা ভাস্কর ও শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁর বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমার এই বই পড়ে যে সুন্দর পরিচায়িকা লিখে দিয়েছেন সেজন্য তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম রইল। পরিশেষে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম বন্ধুবর ও সাহিত্যরসিক সুনীলকুমার চক্রবর্তীকে।

চিত্রশিল্প জগতে আজকাল অনেক নতুন মেয়ে আত্মনিয়োগ করছেন নতুন নতুন সম্ভাবনা নিয়ে। আমার এই বই তাদের মনে যদি কিছুমাত্র আশার আলো জাগাতে পারে তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। পাঠকবৃন্দের কাছে বইটি সমাদর পেলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

দক্ষিণ গোবিন্দপুর — জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪ পরগণা

যাঁদের নিয়ে লেখা

সুচারু দেবী

শিল্পীমন ও জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা যে বৈচিত্রময় মানবজীবনের নিত্যসাথী তা তিরাশী বছরের বৃদ্ধা মহারাণী সুচারু দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে বুঝতে পারলাম। কারণ, অসুস্থ দেহেও তাঁর নিয়মিত চিত্রাঙ্কন এবং বিভিন্ন পুস্তক-পত্রিকা পাঠ দৈনন্দিন কর্মধারার অনেকটা স্থান জুড়ে রয়েছে। এই স্বনামধন্যা পরহিতব্রতী, মাতৃতুল্যা মহিলার সরল ও সুমধুর ব্যবহার দর্শন-প্রার্থীর মনে এক গভীর রেখাপাত করে।

"নব-বিধান" প্রবর্তক ভারতবরেণ্য মনীষী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের তৃতীয়া কন্যা ও চতুর্থ সন্তান সুচারু দেবী ১৮৭৪ সালে কলুটোলা ষ্ট্রীটস্থ দেওয়ান রামকমল সেনের গৃহে জন্মগ্রহন করেন। ঘরের পাঠ সমাপ্ত করে সাত বৎসর বয়সে তিনি Miss Spight এর মিশনারী বিদ্যালয়ে (Church of Scotland) ভর্তি হন। পরে তিনি Victoria Institutionএ যোগদান করে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে তিনি খুল্লতাত কৃষ্ণবিহারী সেন ও উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পান। ১৮৮৪ সালে ব্রহ্মানন্দের মৃত্যুর পর জগন্মোহিনী দেবী আদর্শ জননীরূপে প্রতিভাত হন। পাঠ্যাবস্থায় সুচারু দেবী তদানীন্তন মহিলা সঙ্ঘের (National Ladies' Association) একজন সক্রিয় সদস্য থাকায় নানারূপ সমাজসেবার কর্মে নিজেকে নিযুক্ত করেন। ইহাই পরে All India Woman's Conference-এ (A.I.W.C.) পরিনত হয় এবং মহারাণী বিভিন্ন সময়ে উহার সম্পাদিকা ও সভানেত্রীপদে বৃত হন। উহার করাচী অধিবেশনে তিনি প্রথম অলিখিত

বক্তৃতা দেন। এ ছাড়া তিনি নিখিল বঙ্গ মহিলা সঙ্ঘ, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন, রামকৃষ্ণ মিশন, একাডেমী অব্ ফাইন আর্টস, বাহাই [ইরাণ] সম্প্রদায় সম্মেলন, রেডক্রশ, ভারত মহিলাশ্রম, ব্রাহ্মযুব-সঙ্ঘ প্রভৃতি নানা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। বারিপদার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "ব্রাহ্ম-মন্দির" মহারাণীর আনুকূল্যে নির্মিত হয়।

১৯০৪ সালে দেশীয় রাজ্য ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও-র সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯১০ সালে তিনি মহারাজার সহিত ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করেন। দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯১২ সালে ময়ূরভঞ্জ মহারাজা রামচন্দ্র দেহত্যাগ করায় তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

১৯৩২ সালে তাঁর কন্যা জয়ন্তী দেবীর সঙ্গে নন্দগাঁও মহারাজার বিবাহ হয় এবং পুত্র ব্যারিষ্টার ধ্রুবেন্দ্র দ্বিতীয় মহাসমরের সময় (১৯৪২ সালে) যুদ্ধকার্যে লিপ্ত থাকাকালীন বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। তাই মহারাণী জানালেন "আদর্শ স্বামী ও প্রাণপ্রতিম পুত্রকে হারিয়ে আমার বৈরাগ্যের জীবন চলছে এখন।" অবশ্য প্রথম থেকেই তিনি সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।

পূর্বাঞ্চলে দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে নানারূপ জনহিতকর উন্নয়নমূলক কর্মে যে ময়ূরভঞ্জ সর্বাগ্রগন্য রাজ্য হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা মহারাণী সুচারু দেবীর আগ্রহে এবং পূর্ণচন্দ্রের উদ্যোগে ও মহারাজা প্রতাপচন্দ্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্ভবপর হয়।

গত শতাব্দীতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সার্কুলার রোডস্থিত "Lily Cottage" এ তদানীন্তন জ্ঞানী, গুণী ও ধার্মিক ব্যক্তিদের একটি প্রধান মিলন কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তজ্জন্য সুচারু দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহামতি গোখেল,

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। এই সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলে মহারাণী জানালেন, "মহর্ষি আমার দাদার নামকরণ করেছিলেন করুণাচন্দ্র। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও আমার পিতাঠাকুরকে হাত ধরাধরি করিয়া গৃহে নৃত্য করিতে দেখিয়াছি আর আমার ঠাকুরমাকে নিজ মায়ের মতন পরমহংসদেব মনে করিতেন— মহামতি গোখেল মহারাজার মৃত্যুর পর সান্ত্বনা দিয়া আমায় বলেছিলেন যে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য যেন নিজেকে ব্যস্ত রাখি—স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ) আমাদের গৃহে 'নব বৃন্দাবন' অভিনয়ে 'ঋত্বিক' করেছিলেন আর সাত বৎসরের আমি ও আমার ছোট বোন উহাতে অংশ গ্রহণ করি,—বাগ্মী বিপিন পাল বলতেন যে অনেক কথা বলার আছে—তোমরা আমায় বলিয়ে নাও—মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সাক্ষাৎ-প্রার্থী আমাকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বললেন—Sword is hanging on me আর আমার হাতের ফুলগুলি তাহার বুকের উপর রাখিতে বলেন।" ইহা ছাড়া লেডি অবলা বসু, মিসেস পি. কে. রায়, সরলা দেবী, হেমলতা দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বাসন্তী দেবী, মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারকর ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি প্রভৃতির সহিত তাঁর কর্মজীবনে ঘনিষ্ঠতা হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সহিত পণ-প্রথা সম্বন্ধে একবার এক আলোচনা সভায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে মহাত্মা গান্ধীর কলকাতায় অবস্থানকালীন মহারাণী তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সরোজিনী নাইডু তাঁকে "মাসীমা" বলে সম্বোধন করতেন।

বাল্যকাল হতেই তাঁর চিত্রাঙ্কনে অনুরাগ থাকায় ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে তিনি বহু চিত্রশিল্প সংগ্রহ ও অঙ্কন শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁর অঙ্কিত তৈলচিত্রগুলি বিবিধ প্রদর্শনীতে ভূয়সী প্রশংসা পায়। এ ছাড়া যে সমস্ত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা সে সময়ে ঐ বাড়ীতে ভীড় জমাতেন তাঁরাও সুচারু দেবীর অঙ্কনরীতির কলাকৌশলে

মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। অতদিন আগেকার কথা বর্ষীয়সী এই বরেণ্য শিল্পীর আজ আর সব মনে নেই তবে সে সময় মহিলাদের পক্ষে বিশেষ করে গৃহস্থ বধূদের পক্ষে চিত্রশিল্পে মনোনিবেশ করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার ছিল। এখনকার মত এত সব পত্র-পত্রিকা তখন ছিল না আর প্রদর্শনীরও এত আয়োজন ছিল না তবু ছবি আঁকার জন্য কোনরকম আন্তরিকতারও অভাব ছিল না বলে শিল্পী জানালেন। বলেছিলাম, আপনার দু একটা ছবি দিন না যাতে করে বর্তমান কালের মেয়েরা ঐ সব উচ্চাঙ্গের শিল্প সৃষ্টি দেখে আনন্দলাভ করতে পারে। উত্তরে মহারানী জানালেন, কোথায় পাব সে সব ছবি। সে কি আর আছে। আর যদি বা কোথাও থেকে থাকে তা আমার জানা নেই। কথা কইতে কইতে বিকেল গড়িয়ে এল। শেষ সূর্যের আলো এসে পড়লো শিল্পীর চোখে মুখে। আর অপেক্ষা না করে গুণী এই শিল্পীকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম।

মাত্র কিছুকাল আগে শুনলাম, দুই শতাব্দীর সেতুস্বরূপা এই মহিয়সী মহিলা পরলোকগমন করেছেন।

সুনয়নী দেবী

মনোবিজ্ঞান বলে, যদি কেউ নিজের কোন সাধু প্রচেষ্টা অপূর্ণ রেখেই মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয় তাহলে তার সন্তানদের মধ্যে আপনা থেকেই পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করার অনুপ্রেরণা আসবে। এর প্রত্যক্ষ নিদর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে। 'বাবুবিলাস' গ্রন্থের প্রণেতা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখনী ধারণ করলেও শিল্পের প্রতি অনুরাগ তাঁর কম ছিল না। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে ইনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ডিসেম্বর ১৮৫৪)। বাবার শিল্পী মনের ছায়া পড়ল ছেলেদের মনে। বড় ছেলে গণেন্দ্রনাথ চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবেন হিন্দুমেলার অন্যতম মীনাররূপে। হিন্দুমেলার সংগঠক এই তরুণ দেশসেবীর মাত্র ২৭ বছর বয়সে (১৮৬৮) জীবনাবসান হয়। ছোট ছেলে গুণেন্দ্রনাথ জ্যাঠতুতো ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে ভর্তি হলেন সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে—পাঠ নিলেন অঙ্কনশাস্ত্র। বাবার ও দাদার দেশপ্রেম ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের অধিকারী হলেন পূর্ণমাত্রায়। এ ছাড়া কৃষি ও উদ্ভিদ বিদ্যাতেও গুণেন্দ্রনাথের দক্ষতা ছিল যথেষ্ট পরিমানে। ৩৪ বছরের যুবক গুণেন্দ্রনাথ যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন পূর্ণতার দিকে, শুভ্রোৎপল যেন ধীরে ধীরে মেলছিল তার পাপড়ি, জীবন-বীনায় যখন বেজে উঠেছিল আসোয়ারীর তান তখন হঠাৎ এক দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় নিভে গেল গুণেন্দ্রনাথের জীবনদীপ (১৮৮১)। তাঁর অন্তর্বাসনা প্রস্ফুটিত হল না, কল্পনার মায়াজালেই সে রইল বন্দী।

গুণেন্দ্রনাথের আশা অপূর্ণ রয়ে গেল বলেই তাঁর ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের মধ্যেই জেগে উঠল শিল্পপ্রীতি। তারই ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি কিউবিজমের পুরোধা শিল্পাচার্য গগনেন্দ্রনাথকে। পাণ্ডিত্যের

সমাহিত দীপ্তি সমরেন্দ্রনাথকে, বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল আধুনিক শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা অবনীন্দ্রনাথকে। বিনয়নী দেবী আর সুনয়নী দেবীকে। গগনেন্দ্র অবনীন্দ্র-সুনয়নীর শিল্পখ্যাতি সর্বজনবিদিত কিন্তু সমরেন্দ্র বিনয়নীও ছিলেন উঁচুদরের শিল্পী। এখানেই শেষ নয়, ঐ বংশে এর পরেও দেখা দিয়েছেন একাধিক শিল্পী, গগনেন্দ্র পুত্র নরেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্র পুত্র ব্রতীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র পুত্র অলোকেন্দ্রনাথ।

যশোর জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামের যদুনাথ রায়চৌধুরীর মেয়ে সৌদামিনী দেবীর গর্ভে ১৮৭৭ সালের এক শুভলগ্নে জন্ম নিলেন সুনয়নীদেবী। যদুনাথের আর এক মেয়ে সত্যকুমারী ছিলেন সঙ্গীত নায়ক রাজা স্যার শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরের দ্বিতীয় সহধর্মিনী। এঁদেরই পুত্র শিল্পপ্রাণ মহারাজা স্যার প্রদ্যোতকুমার ও দৌহিত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতে খ্যাতিমান শিল্পী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ছ'বছরের মেয়ে সুনয়নী বাবাকে হারালেন। জীবনের পথে এগোতে লাগলেন মা ও দাদাদের স্নেহচ্ছায়ায় নিজেকে আবৃতা রেখে। যথারীতি শুরু হলো বিদ্যাশিক্ষা। যথাসময়ে বেজে উঠল মিলনের মঙ্গলশঙ্খ। ভারতের নবযাত্রাপথের প্রথম পথিক রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্রীপুত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিণীতা হলেন সুনয়নী।

দেখতে দেখতে এলো উনিশশো পাঁচ সাল। পাঁচ সালের তাৎপর্য বা মহিমা দু'চার কথায় লিপিবদ্ধ করার নয়। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণমঞ্জুষায় উজ্জ্বল এই পাঁচ সালের ইতিকথা সংরক্ষিত থাকবে চিরদিন। দেশের উন্নতি সাধনে বাঙলা দেশের ঠাকুর পরিবারের অবদান অসীম। যেদিন দেশের অধিকাংশ ধনিক সম্প্রদায় সুরায় মত্ত এঁরা সেদিন মেতে উঠলেন সুরে, ওরা দিগ্‌ভ্রান্ত আলেয়ার হাতছানিতে, এঁরা এগিয়ে গেছেন আলোর সন্ধানে, ওরা সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন বারবণিতাদের বিলাসিতায় আর এঁদের হৃদয় ভরা শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছিল বীরাঙ্গনাদের প্রতি।

ঠাকুর পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবনায় ভরিয়ে তুলতে লাগলেন দেশ, দশ ও জাতিকে। সুনয়নী ধরলেন অঙ্কনের পথ। কারো কাছে নিলেন না শিক্ষা। অন্তরের প্রেরণায় দুর্দমনীয় বেগে এঁকে গেছেন ছবি, কারো কাছ থেকে কোন কিছু প্রত্যাশা করেননি। এলেন এক মেমসাহেব সুনয়নীকে শিক্ষা দিতে। ছাত্রীর অন্তর স্পর্শ করল না বিদেশিনীর শিক্ষাদানের ধারা। শিক্ষাগ্রহণ পর্ব সেখানেই হল ইতি। সুনয়নী যখন তুলি ধরেছিলেন তখন বাড়ীতে তাঁর তিন দাদা ও দিদি অঙ্কন সাধনায় মগ্ন। আশ্চর্য। এঁদের কারোরই প্রভাব পড়ল না তাঁর আঁকায়। বরং তাঁর ছবিতে যেটুকু অপরের প্রভাব পাওয়া যায় তা হচ্ছে রাজা রবি বর্মার। পৌরানিক চিত্রাঙ্কনে এবং চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাক অবনীন্দ্র যুগে রবি বর্মা ছাড়া এদেশে আর প্রায় কেউ ছিলেন না বললেই চলে। সুনয়নীর অঙ্কিত চিত্রাবলী বেশীর ভাগই পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে। এঁদের ছোট পিসীমা কাদম্বিনী দেবীর ঘরের দেওয়ালে টাঙানো থাকতো অসংখ্য দেব দেবীর ছবি। সেগুলি অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে সুনয়নীর ওপর। এঁর অঙ্কিত ছবি বহু সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে ও দেশ বিদেশে অনেক স্থানে হয়েছে প্রদর্শিত। এঁর বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে অর্ধ-নারীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, নীল অঞ্জনা, বাঁশুরিয়া, মা ও ছেলে প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'অর্ধনারীশ্বর' ছবিটি প্রথমে শিল্পী বাতিল করে দেন পরে তা সংগ্রহ করে রাখেন গগনেন্দ্রনাথ। এখন অবশ্য তা স্রষ্টার আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হয়েছে। সুনয়নীর মত চোখ ও ভুরু আঁকার হাত আর দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে দেখতে পাননি গগনেন্দ্রনাথ। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সুনয়নীর আঁকা ছবিকে 'মাষ্টারপিস' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, পরম পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

ব্রাস দিয়ে কি করে ওয়াশ করতে হয় সুনয়নী তা ভাল জানতেন। এঁরই এক বোনপো শিল্পী অসিত কুমার হালদার মহাশয়

যখন কাজ করতেন সেই সময় তা দেখে দেখে শিখে নিয়েছিলেন সুনয়নী। ঠিক এমনিই দেখে বা শুনে আরও অনেক কিছু আয়ত্তে এনেছিলেন সুনয়নী। মাত্র অভিধানের সাহায্যে শিখেছিলেন ইংরেজী এবং সে ভাষায় বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। পিয়্যানো বাজনা শিখেছিলেন আঙ্গুলের চিহ্ন দেখে। এমনই প্রতিভাময়ী মেয়ে সুনয়নী দেবী। এঁর কয়েকখানি ছবি বহন করছে দেহ লাবণ্য সুষমার সৌন্দর্য, কোন বা কোনটি দেখা দিচ্ছে রূপ-রস-রেখা-রঙের প্রতিভূরূপে। ছেলেবেলায় গান শিখেছেন মায়ের কাছে। শিখেছেন এস্রাজ বাজাতেও। অভিনয় প্রীতিও সুনয়নীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। চরিত্ররূপও দিয়েছিলেন বাড়ীতে অভিনীত কয়েকটি নাটকে। একটির পরিচালনাও করেছিলেন।

কালীক্ষেত্র কলকাতা। তার উত্তরার্ধে জোড়াসাঁকো অঞ্চল। সেখানেই যুবরাজ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাসপুরী। তারই সংলগ্ন বাড়িটিতে বসত তাঁর প্রাত্যহিক বৈঠক। ঠাকুর পরিবারের মধ্যে এ দুটি বাড়ীর দুটি ডাকনাম ছিল, তা হল বড়বাড়ী ও বৈঠকখানা বাড়ী। প্রতিটি সন্ধ্যা সেদিন ঝলমলিয়ে উঠত কত মধু অলোপনে, বেলোয়ারী ঝাড়লণ্ঠনের সে কি অপূর্ব সমারোহ! বৈঠকখানা বাড়ীর প্রতিটি ইট পাথরের মধ্যে জেগে উঠত প্রাণ। যুবরাজের দেহান্তের পর বড়বাড়ী পেলেন তাঁর বড়ছেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। এ বাড়ীর মালিকানা গেল সেজ ছেলে গিরিন্দ্রনাথের হাতে। আজ বৈঠকখানা বাড়ীর চিহ্নমাত্র নাই। ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ঐতিহাসিক দক্ষিণের বারান্দাকে, চমৎকার ভাবে সুনিপুন বাস্তুবিদদের সাহাযে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে শত শত সংস্কৃতির আলোয় উজ্জ্বল গরীয়সী এই শিল্পপুরীকে। স্বাধীন ভারতে শিল্পাচার্যের প্রতি এই অপমান যেমনই কলঙ্কের, তেমনই দুঃখের ও তেমনই লজ্জার!

সুখলতা রাও

সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা ও শিল্পী সুখলতা রাও এর সঙ্গে পরিচয় নেই এমন ব্যক্তি এ দেশে অল্পই আছেন। তবে লেখিকা হিসেবে তিনি যতটা পরিচিত শিল্পী হিসেবে হয়ত ততটা নন। যদিও লেখনী ও শিল্প উভয় দিকেই তিনি বিরাট এক প্রতিভার অধিকারিণী। তাই এই শিল্পীর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ী যেতেই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে এক ন'দশ বছরের মেয়ে এসে প্রশ্ন করল, "কাকে খুঁজছেন? দিদিমাকে? ডেকে দিচ্ছি।" এর পরে আমরা যে বড় ঘরখানায় গিয়ে বসলাম সে ঘরটি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন; কতকটা বিদেশী রুচির অনুকরণে সাজানোও। কিন্তু দেওয়ালে বা দরজায় যে ছবিগুলি টাঙানো আছে দেখলাম,—তার সবগুলির মধ্যেই ছড়িয়ে আছে এদেশের ভাবধারা,—কতকটা আঁকবার পদ্ধতিও। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলোনা। এই দেশী-বিদেশী সজ্জার মধ্যে থেকে যিনি হাসি মুখ নিয়ে বার হয়ে এলেন তিনি খাঁটি দেশী ভাবধারার মেয়ে। এক কথায় মা-দিদিমাদের স্নেহ-মমতায় ভরা মনের উত্তরাধিকারিণী।

শাদা একখানি শাড়ি তাঁর পরনে, তাও নিতান্ত ঘরোয়াভাবে। আর তার ওপর জড়ানো একখানা গরম চাদর।

এরপরে চললো নিতান্ত সাধারণভাবেই আলাপ আর আলোচনা। অনেক গল্প এবং অনেক কাহিনীর মধ্যে থেকেও চললো তাঁরই লেখা 'বেহুলা' বইখানির পাতায় পাতায় আঁকা ছবিগুলোকে নতুন করে

দেখা। এর মধ্যে সবচেয়ে যে ছবিটি শিল্পীর নিজের কাছে ভালো লাগে, সেটি হচ্ছে স্বামীর কঙ্কালের কণ্ঠালিঙ্গনরতা বেহুলা! ছবিটি দেখতে দেখতে মনে হয় জীবন যেন মরণের কণ্ঠালিঙ্গন করছে নিত্যকার ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও। বেহুলার বিষণ্ণ মুখচ্ছবি যেন আরও করুণ করে তোলে দর্শকের অনুভূতিকে। তাঁর আঁকা ছবি ও তাঁরই লেখা ছড়ার বই আগেও দেখেছি, আজও দেখলাম. কিন্তু এখন যেন আরো সুন্দর বলে মনে হল।

এরপর তার নিজের সম্বন্ধে নিজেরই লেখা যা আমাকে দিয়েছেন, উদ্ধৃতি করছি।

"...আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ময়মনসিংহ জেলার একজন জমিদার ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি কলকাতায় এসে বাস করেন। মাঝে মাঝে দেশে যেতেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করবার ফলে দেশে থাকা সুখের ছিল না বোধ হয়। তিনি ছিলেন স্বনামধন্য চিত্রকর এবং লেখক। ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা করতেন। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম হাফটোন ব্লক তৈরী করেন। এ বিষয়ে তাঁর উদ্ভাবিত কতকগুলি নূতন প্রণালী ইংলণ্ডে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে এবং Patented-ও হয়। আমি তাঁর প্রথম সন্তান। সুকুমার রায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মাতামহ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ধার্মিক ও তেজস্বী স্বদেশ-কর্মী ছিলেন। নারীকল্যাণে এবং সমাজকল্যাণে নিজেকে আজীবন নিযুক্ত রেখেছিলেন। শ্রমিকদের দুঃখ মোচনে তাঁর নির্ভীক চিত্ত মৃত্যুকেও ভয় করেনি। চা-বাগানের শ্রমিক আন্দোলনের তিনি একজন নেতা ছিলেন।

পূজনীয় শ্বশুর মহাশয় মধুসূদন রাও মহারাষ্ট্র বংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। উড়িষ্যায় এসে বসবাস করেন তাঁর পিতৃ-পিতামহ। তিনি পুণ্যচরিত্র ভক্ত সাধক ছিলেন এবং ওড়িশ্যার সাহিত্য জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং 'ভক্ত কবি' নামে অভিহিত হন। কলকাতাতেই

আমার জন্ম। সেইখানেই প্রথমে ব্রাহ্মবালিকা স্কুলে এবং পরে রেঙ্গুণ কলেজে শিক্ষা লাভ করি। বিবাহের পরে কটকে এসেছি।

বাবার কাছে থেকে আমি ছবি আঁকবার প্রেরণা পেয়েছি। তিনি অয়েল কালারে দৃশ্যাঙ্কনে দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কখনও মানুষের প্রতিকৃতি এঁকেছেন বলে জানি না। কিন্তু শিশুসাহিত্যেও তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর নিজের বই-এর সমস্ত ছবিই তিনি নিজের হাতে আঁকতেন। এই সমস্ত ওয়াটার কালার ছবি এবং লাইন ড্রয়িং আজ পর্য্যন্ত এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

ছেলেবেলা থেকে স্কুল কলেজের পড়া নিয়েই প্রায় দিন কেটেছে আমার। তখনকার কলকাতার মেয়েদের বাইরে বেরিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকবার সুযোগ ছিলই না বললে হয়। তাই বোধ হয়, দৃশ্যের চেয়ে মানুষের ছবি আঁকবার দিকেই আমার মন যায় প্রথমে। অতি ছেলেবেলা থেকে শ্লেট ভরে ভরে নানা রূপকথার ছবি নিজের মনে আঁকতাম। বিলাতী বই-এর ছবিগুলি চমৎকার লাগত আমার কাছে। সে সময়ের বাংলা পত্রিকা ইত্যাদিতে ভাল দেশী ছবি দেখাই যেত না।

ব্রাহ্ম বালিকা স্কুলে পড়বার সময়ে ড্রয়িং শিখতে হত আমাদের। এনট্রান্স পরীক্ষায় ড্রয়িং-এর গোড়াপত্তন ভাল হওয়াতে পরে বই এর জন্য ছবি আঁকতে সুবিধা হয়েছে। ছবি আঁকবার অভ্যাস বরাবরই রেখেছি। অল্প বয়স থেকেই মানুষ বসিয়ে আঁকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এ কাজে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের পাওয়া মুস্কিল ছিল। একবার একটি ছোট ভাইকে বসিয়ে তার চেহারা আঁকছিলাম। খানিক পরে চেয়ে দেখি বেচারার দুই গাল বেয়ে চোখের জল নেমেছে। আমার হাত কাঁচা, ছবি আঁকতে সময় লাগছিল; অতক্ষণ স্থির হয়ে সে থাকতে পারছিল না।

আমার যখন তের চৌদ্দ বছর বয়স, তখন প্রসিদ্ধ চিত্রকর শশীকুমার হেশ ফ্রান্স থেকে ফিরে কলকাতায় এসে আমাদের পাশের

বাড়ীতে থাকেন। তিনি কতকগুলি অতি সুন্দর পোর্ট্রেট এঁকে এনেছিলেন। সেইগুলি দেখে আমার ইচ্ছা হয় অয়েল কালারে মানুষের ছবি আঁকবার। একখানা ছোট ছবিও এঁকেছিলাম। হেশ মহাশয় সেখানা দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। কিন্তু অয়েল কালারে পোর্ট্রেট আঁকতে শেখার সুবিধা বা সময় আমার হয়নি।

তখন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু এঁরা ভারতীয় পদ্ধতি অনুকরণে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেছেন। 'অনুকরণে' এই জন্য বলছি যে, সে ছবি ঠিক ভারতীয় চিত্রের মত করে আঁকা হত না। অবনীন্দ্রনাথের 'সাজাহানের মৃত্যু', 'তিষ্যরক্ষিতা' প্রভৃতি ছবি এবং নন্দলাল বসুর মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য এবং অন্যান্য ছবি দেখলে বোঝা যাবে সেগুলি এক নূতন পদ্ধতির আঁকা। পরে অবশ্য নন্দলাল বসু খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতেই আঁকতে আরম্ভ করেন। সাজাহানের মৃত্যু, সতী, কার্তিকেয়, কৈকেয়ী, অভিসারিকা প্রভৃতি ছবি আমার এত ভাল লাগে যে, আমি ঐ ধরণের ছবি আঁকাতে আমার সামান্য শক্তি নিয়োগ করি। এই পদ্ধতিতে আঁকা ছবির একটি বিশেষ সৌন্দর্য আছে এবং এতে মনের ভাবই প্রধান হয়ে প্রকাশিত হয়। যাদের ভিতরে আঁকবার প্রেরণা জেগেছে, বিভিন্ন প্রদর্শনীতে বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা ছবিগুলি তাদের যে কত আকৃষ্ট করে, তাদের কত উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করে তা বলে শেষ করা যায় না। ওয়াটার কালারে কতকগুলি ওরিজিনাল ছবি আঁকি। 'পূজারিণী' ছবিই বোধ হয় প্রথম ছাপা হয় 'প্রবাসী' কাগজে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' কাগজে আমার আঁকা অনেকগুলি ছবি ছাপিয়ে আমাকে খুবই উৎসাহিত করেন। সে সমস্ত ছবি প্রশংসা লাভ করেছিল। সেইজন্য পরে বেহুলা গল্পের বারোখানি রঙীন ছবি এঁকেবারে বই লিখে ছাপতে সাহসী হই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'বেহুলা' বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। ছবিখানি তাঁর ভাল লেগেছিল বলে আমাকে বলেছিলেন। তিনি ইচ্ছা করাতে

'সন্দেশ' কাগজে প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতার ছবি এঁকে দিয়েছিলাম।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথও আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। তখন আমার বয়স অল্প। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউতে সবে ছবি ছাপা আরম্ভ হয়েছে। মডার্ণ রিভিউতে ছাপা 'In Quest of the Beloved' নামে সাবিত্রীর একখানা ছবি দেখে একজন ইউরোপীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছবিখানা কিনতে চান বলে রবীন্দ্রনাথকে জানান। তিনি আমাকে লিখে ছবিখানা ঐ ইউরোপীয় কর্মচারীকে পাঠিয়ে দেন।

এর আগে থেকেই অয়েল কালারে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকবার ইচ্ছা হয়। স্কুল কলেজের ছুটিতে আমরা অনেক সময়ে কলকাতার বাইরে গিরিডি, মধুপুর, চুনার, পুরী, দার্জিলিং প্রভৃতি নানা জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি। সে সকল স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য মনের মধ্যে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে। সেই মাল-মশলা নিয়ে পরে অয়েল কালারে মনগড়া ছবি এঁকেছি। আঁকবার জন্য বাবা ভাল ভাল সরঞ্জাম আমাকে দিয়েছিলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতার প্রদর্শনীতে একটি সূর্যাস্তের দৃশ্যে (অয়েল) রৌপ্যপদক পাই। তারপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের প্রদর্শনীতে 'of the best original water-colour printing' (বেহুলা গল্পের বোধহয়) ব্রোন্‌জ্ মেডাল পাই। তারপরে আর প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতার জন্য ছবি দিইনি। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আঁকবার সুবিধা হয় আমার বিবাহের পর যখন কটকে আসি। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। এখানে নদীর ধারে ছবি আঁকতে বসলে, লোকে তামাসা দেখতে ভীড় করে আসত। সেই জন্য আমার স্বামী ও আমি কখনও কখনও নদীর ধারে কোনও নির্জন স্থানে গাছের ছায়ায় বসতাম। তিনি ডাক্তারী পরীক্ষার কাগজ দেখতেন, আমি ছবি আঁকতাম। এমনি করে দু'একখানা ল্যাণ্ডস্কেপ বা নিসর্গ দৃশ্য

এঁকেছি। এক সিভিল সার্জেনের মেম চমৎকার ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকতেন ওয়াটার কালারে। তাঁর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে একদিন নদীর ধারে যাই ছবি আঁকতে। কিন্তু তাঁর ছবির কাছে আমার ছবি কিছুই হয়নি। সেই থেকে ওয়াটার কালারে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকা আর চেষ্টা করিনি। এখানের একজন কমিশনার আমাদের পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁদের বারান্দায় বসে ছবি আঁকবার সুযোগ দেন। এখন যেটা কটকের রাজভবন, তখন সেটাই ছিল কমিশনারের বাড়ী। ঐ বাড়ীর উপরের মস্ত বারান্দা থেকে কাঠজুড়ি নদীতে চমৎকার সূর্যাস্ত দেখা যায়। আমার স্বামী অণ্ডলে সিভিল সার্জন থাকার সময়ে গভীর জঙ্গলে, মহানদী যেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে, যাকে 'সতকোশিয়া গণ্ড' বলে, সেইখানে বসেও ছবি এঁকেছি।

চিত্রাঙ্কনে ধারাবাহিক শিক্ষা পাবার সুবিধা আমার হয়নি। কিন্তু, বাবা যখন আঁকতেন, আমি কাছে বসতাম এবং তিনি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে অনেক শিক্ষা দিতেন আমাকে, ড্রয়িং, কালারিং, কম্পোজিশান ইত্যাদি সম্বন্ধে। সে শিক্ষা আমার বিশেষ উপকারে এসেছে। আমার আঁকা ছবির দোষ ধরে দিতেন তিনি, যাতে আমি সে দোষ পরের ছবিতে শুধরিয়ে নিতে পারি। আমার লেখা সমস্ত বইএর ছবিই আমি এঁকেছি, বাবার কাছে উৎসাহ পেয়ে। মেয়েদের মধ্যে বোধহয় আমিই প্রথম নিজের বই নিজে চিত্রিত (illustrate) করি, বিশেষতঃ বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে। সে সব বই ও ছবির খুব ভাল সমালোচনা হয়েছিলো। স্বর্ণকুমারী দেবীর অনুরোধে তাঁর একখানা ইংরাজী গল্পের বইএর ছবি এঁকে দি।

আমার স্বামী কিছুদিন পুরীতে সিভিল সার্জন হিসেবে ছিলেন। সে সময়ে সমুদ্রের রূপ পর্যবেক্ষণ করবার অবসর পেয়েছি। পুরীর অধিকাংশ ছবিই দিনে বা রাত্রে দেখা সমুদ্রের স্মৃতি অবলম্বন করে আঁকা। চোখের অসুখের জন্য অনেক বছর আঁকা বন্ধ ছিল। যা

এঁকেছি, সংসারের কাজ কর্মের ভিতরে, কেবল আঁকবার অনুরাগেই এঁকেছি। অনেক অনেক ভুল ত্রুটি আছে তাতে। যা সুন্দর তা মুগ্ধ করে আমাকে এবং তাকে রঙে রেখায় ফুটিয়ে তুলতে ইচ্ছা হয়। এখনও ইচ্ছা হয়, কিন্তু শক্তি নেই···"।

আমাদের দুর্ভাগ্য শ্রীমতী রাও আজ আমাদের মধ্যে নেই। এই লতা পাতা, ফুল, গাছপালা, জীবজন্তু যে নিপুন শিল্পীর হাতের সৃষ্টি তাঁরিই ডাকে তিনি এই ধরার বুক থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

রানী চন্দ

সাহিত্য প্রেমিক বাঙ্গালী মাত্রেই রাণী চন্দের নামের সাথে আজ সুপরিচিত। "পূর্ণকুম্ভ," "ঘরোয়া", "জেনানা ফটক", "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ", "জোড়াসাঁকোর ধারে", "গুরুদেব" প্রভৃতি পুস্তক বাংলা সাহিত্যের এক একটি রত্ন।

এতগুলো বই লিখেছেন কিন্তু শ্রীমতী চন্দ সব চেয়ে ভালবাসেন ছবি আঁকতে। তাঁর আঁকা ছবি দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে। তা হবেই না বা কেন? বড় ভাই মুকুল দে ভারতবিখ্যাত শিল্পী। অপর ভাই মনীষী দে-ও তাই।

তাঁর নয়াদিল্লীর সোনেরিবাগের বাড়ীতে বসে সেই আলোচনাই হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, আপনার কি মনে পড়ে কবে আপনি প্রথম ছবি আঁকেন? ছবি আঁকাতেই বা আপনার ঝোঁক এল কেন?"

শ্রীমতী চন্দ বললেন, আমি তখন ছোট। দাদার (মুকুল দে) স্কেচগুলো রাখা থাকতো মায়ের একটা প্রকাণ্ড বড় বাক্সতে। বছরে একবার করে সেগুলো রোদে ছড়ানো হতো যাতে ছবিগুলো না নষ্ট হয়ে যায়। আমাকে সেই স্কেচগুলো পাহারা

দিতে হতো। ছবি পাহারা দিতে গিয়ে আমার মন চলে যেত এক অজানা জগতে। মনে মনে ভাবতাম, আমিও কি এরকম ছবি আঁকতে পারব না! একখানা খাতা জোগাড় করলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে তাতে ছবি আঁকা শুরু করলাম।"

আমি বললাম, "লুকিয়ে কেন?"

"লুকিয়ে কেন জানো না? মা বলতেন, মেয়েরা আবার ছবি এঁকে সময় নষ্ট করে নাকি?"

আমি বললাম, "তারপর"?

"দাদা তখন বিলেতে। বিলেত থেকে এসে আমার ছবির খাতাখানা আবিষ্কার করে তিনি মহা খুশী! আমার প্রথম ছবি হরপার্বতী বেশ বড় ক্যানভাসেই এঁকেছিলাম।"

১৯১২ সালের ৩০-এ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরে শ্রীমতী চন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদেব স্বর্গীয় কুলচন্দ্র দে মহাশয় তখন সেখানে পুলিশ অফিসার ছিলেন। মায়ের নাম পূর্ণশশী দেবী। কর্মের সূত্রে পুলিশ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও কুলচন্দ্রের অবসর অতিবাহিত হোত সাহিত্য সাধনায়। কবিতা রচনায় তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। শ্রীমতী চন্দ পিতৃহারা হন শৈশবে। এই সময় তাঁরা মেদিনীপুর ছেড়ে ঢাকায় চলে যান। সেখানেই তাঁর বিদ্যারম্ভ।

শ্রীমতী চন্দ ষোলো বছর বয়েসে শান্তিনিকেতন যান। তার পূর্বে ক্যালকাটা স্কুল অফ আর্টের প্রিন্সিপ্যালের বাড়ীতে (দাদা মুকুল দে তখন প্রিন্সিপ্যাল) থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা দেখার সুযোগ পান। গুরুদেব মাঝে মাঝে সেখানে আসতেন। তাঁর ছবি আঁকার উৎসাহে তিনিও ছবির দিকে ঝোঁক দেন। রাণী চন্দ ইংরেজী সাহিত্যের পাঠও গুরুদেবের কাছেই নিয়েছেন।

শান্তিনিকেতনে এসে পরিচয় হল নন্দলাল বসুর সঙ্গে। বেশ কিছুদিন তাঁর কাছে রাণী তালিম নিলেন। আর্টে তখন শান্তিনিকেতনে কোনো ডিগ্রী কোর্স ছিল না। ছাত্রদের হাজিরের ওপরও কোন

জোর দেওয়া হত না। ক্লাসে কেউ না থাকলেই শিক্ষক মশাই ধরে নিতেন নিশ্চয় স্নাতক 'আউট ডোর' স্কেচ করতে গেছে। ছবি আঁকার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হত যদি না তাঁর স্বামী এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিতেন।

শ্রীযুক্ত অনিল চন্দর সঙ্গে রাণীর বিবাহ হয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে। বিবাহের মন্ত্র পাঠ করান গুরুদেব স্বয়ং।

"ছবি আঁকতে ঢিলে দিলেই উনি রাগ করতেন। শান্তিনিকেতনে তখন শ্রীযুক্ত চন্দ গুরুদেবের সেক্রেটারী। লোকজন, অতিথি অভ্যাগতর ভিড় লেগেই আছে। তাদের দেখাশুনা করে ওরই এক ফাঁকে ছবি এঁকেছি।"

রাণী সৌভাগ্যবতী। তিনি স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের সান্নিধ্য, আশীর্বাদ ও স্নেহে ধন্য হয়েছেন।

শান্তিনিকেতনে তিনি রবীন্দ্রনাথের অতি নিকটে ঘনিষ্ঠভাবে আসার সুযোগ পেয়েছেন। সেই বিরাটপুরুষের প্রয়ানে ব্যথিত চিত্তে রাণী ছবি আঁকার ভিতরে ডুবে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথ তখন ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। ১৯৪২ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারাবরনে শিল্পীর ছবি আঁকা বন্ধ হয়। ছবি আঁকা বন্ধ হলে কি হবে, জেলেতেও এই কর্মসাধিকার কাজ কেউ বন্ধ রাখতে পারলো না। তিনি সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। কারাবরণের দিনগুলো অমর হল "জেনানা ফাটকে।"

জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ বললেন, কয়েকখানা ছবি আঁকতে। তিনি শুরু করেন, অবন ঠাকুর শেষ করেন। দুজনেই সেই একসেট ছবিতে যুগ্ম স্বাক্ষরে চিত্রজগৎকে এক মহামূল্য সম্পদ দিলেন।

আমি বললাম, "বেড়াতে আপনি হোধ হয় সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন?"

শ্রীমতী চন্দ বললেন, "কে না ভালবাসে বল ?"

"কোন্ দেশ বা জায়গা আপনার কাছে সব চেয়ে বেশী ভালো লেগেছে বলুন তো ?"

"বিদেশের অনেক জায়গাই ভালো লেগেছে। তবে হিমালয়ের তুলনা নেই। শিখর থেকে শিখরে চড়ে যখন ধ্যানগম্ভীর সেই হিমালয়ে হাঁটি তখম মন যেন কোন্ এক অজানা জগতে চলে যায়। তার তুলনা নেই।"

মনে মনে বললাম, এই অনুভূতি রয়েছে বলেই তো "হিমাদ্রি" বইখানা এত গভীর ভাবে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করেছে। "হিমাদ্রী" বইখানার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীমতী চন্দকে ভুবনমোহিনী পুরস্কার দেন। "পূর্ণকুম্ভ"র জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে তাঁকে দেওয়া হয় রবীন্দ্র পুরস্কার।

শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ ও শ্রীমতী চন্দর একটি সন্তান—অভিজিৎ। গুরুদেবই তাঁর নামকরন কবেন। অভিজিৎও অতি সুন্দর ছবি আঁকতে পারেন। কিন্তু অভিজিৎ শিল্পীর জীবন পছন্দ করেন না। তুলির চেয়ে তিনি বন্দুক পছন্দ করেন।

আমি বললাম, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করা বাকী ছিল। আপনি লিখতে বেশী ভালোবাসেন, না আঁকতে ?"

তিনি বললেন, "দুটোই আমার ভালো লাগে। তবে সাহিত্য ক্ষেত্রে আমার কোনো দায়িত্ব আছে বলে মনে করি না। লিখতে ভাল লাগে তাই লিখি। আঁকাটা হচ্ছে সর্বযুগের সর্ব মানুষের ভাষা তাই বোধ হয় আঁকাটাকেই বেশী ভালবাসি।"

আমি বললাম, কোন্ ছবিখানা আপনার ভালো হয়েছে বলে মনে করেন ?

শ্রীমতী চন্দ বললেন, হরপার্বতী। ছবিখানা অভিজিৎ-এর কাছে আছে। মায়ের কাছ থেকে ছবিখানা তিনি পেয়েছেন শ্রীমতী শিপ্রার সঙ্গে তাঁর পরিণয় উপলক্ষে।

সম্প্রতি যে সব ছবি এঁকেছেন তার ভিতর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি হল জয়দেবের মেলা, সাঁওতালি বিয়ে ও বুদ্ধদেবের জীবনীর ওপর এক সেট ছবি।

শ্রীমতী চন্দ কখনও বিদেশী রঙ ব্যবহার করেন না। নিজে তিনি রঙ তৈরী করে নেন।

নমিতা ঘোষাল

"অনেক দুঃখ, কষ্ট, ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে জীবনের উপর দিয়ে। দুখের অনলে দগ্ধ হতে হয়েছে। অনেক কণ্টকাকীর্ণ পথ পার হতে হয়েছে। সারা দেহ-মন ক্লান্তি আব অবসাদে ছেয়ে গেছে। দু'নয়ন ছেয়ে গেছে জলে আর জলে। ক্যানভাসের উপর ছবিগুলো হিজিবিজি কয়েকটা রেখা বলে মনে হয়েছে। কাঁপা কাঁপা হাত থেকে তুলি পড়ে গেছে মাটিতে। পাথর বুকখানা কেবলই ভারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। শৈশবে তো নয়ই। সেখানে ছিল অনেক —অনেক আনন্দ, মুঠো মুঠো খুশী। প্রজাপতির পাখায় ভব কবে করে বেড়াতাম এদিক ওদিক। না বলতেই য. পেয়েছি তাই দুহাত ভরে নিয়েছি! কৈশোব পেরিয়ে যৌবনে পা-দিলাম। দেহে ও মনে অদ্ভুত

এক পরিবর্তন। ক্ষণে ক্ষণে শিহরণ জাগে প্রতিটি লোমকূপে। নারীর অবলম্বন স্বামী পেলাম, সংসার পেলাম। সে এক আনন্দ, সে এক অনুভূতি। হৃদয় দিয়ে যা শুধু অনুভব করা যায়। তুলি চলল মন চলল, সত্যিকারের এবার প্রাণের বদলে প্রাণ পেলাম, মান বেড়ে গেল। ক্যানভাসের উপর আঁকা ছবিগুলো নাকি অপূর্ব জনসমাদর লাভ করেছে। পুরস্কার আসতে লাগল। স্বামী খুশী, শাশুড়ী নববধূর গুণে আহ্লাদিত। 'আরো ছবি আঁক। আরো সময় নাও। অভাব

কিছুর হলে বলো। 'আমি আছি।' স্বামী আগ্রহ দেখাতে লাগলেন, ভরসা দিলেন্। আনন্দে, গর্বে ভরে গেল বুকখানা। শক্তি বেড়ে গেল। কিন্তু অদৃষ্টদেবতা দূর থেকে বোধহয় হেসে উঠেছিলেন। তাঁর খাতায় যোগ-বিয়োগের অঙ্ক মিলিয়ে নিচ্ছিলেন। জানতে পারিনি তাঁর খাতা ঠিক রাখার জন্যে আমার মনের ঘরে চিকে মারবেন, আমার হৃদয় শূন্য করবেন। হঠাৎই বলা চলে, বৈধব্যযোগ ঘটল আমার। তারপর আগেই বলেছি কেমন যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব আমার মধ্যে। প্রবল বেগবতী নদী যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু একমাত্র পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছি। আবার তুলি কলম চালিয়েছি, একের পর এক ছবি এঁকেছি। সম্মান পেয়েছি। পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু—" একটু থেমে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে শিল্পী বললেন, "আমি আছি, এ কথাটা আর জীবনে শুনতে পাব না। সব কিছু পাওয়ার মধ্যে ঐ ব্যাথাটুকু আজো আমার রয়ে গেল।"

রামকৃষ্ণ দাস লেনের ন'নম্বর বাড়ীতে বসে সেদিন কথা হচ্ছিল যে শিল্পীর সঙ্গে, তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী নমিতা ঘোষাল। বললেন, "আমার জীবনে এ সব কাহিনী যেন লিখবেন না, আমার শিল্প সম্বন্ধেই লিখবেন।" কিন্তু শিল্পীর জীবনের এই বেদনাময় দিনগুলির কথা পাঠকদের না জানিয়ে আমি থাকতে পারলাম না।

আমি শিল্পীর শিল্পকর্ম জেনেছি, শিল্প সম্বন্ধে নানা আলোচনা করেছি কিন্তু যা দেখিনি সেটা হচ্ছে তাঁর মন। যে মন দিয়ে তিনি এমন এমন সব প্রাণবন্ত ছবি আঁকেন। কি তার রূপ, কি তার ভাষা! মনে হয় সত্যিকারের কতকগুলো মানুষ যেন চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশ্বের কোন এক বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা সিংহের একখানি ছবি দেখে কোন সমালোচক বলেছিলেন,—He is so alive that it looks as if he would walk straight out from this picture. অর্থাৎ ছবি দেখতে এমনই জীবন্ত যে মনে হয় যেন ছবি থেকে সিংহটি সোজা বেরিয়ে আসবে। কতটা নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা থাকলে

না এমন ছবি সব তৈরি হয়!···ছবিগুলি যেন সৌন্দর্যস্নাত। কলার ইন্দ্রজালেই চিত্রকে এমন বৈচিত্রময় করে তোলা সম্ভব। শিল্পের সার্থকতা তো ঐখানেই। দেশে কালে মানুষ সে জন্যেই তো সৃষ্টির মৃৎপ্রতিমা নিয়ে আশ্বস্ত হয়নি···তারই হাতে সৃষ্টি অপরূপ ও অসীম রূপ পেয়ে ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠেছে। শিল্পীরা সৃষ্টির পরিধি বাড়িয়েছে—মানুষকে উচ্চতর লোকের অধিকারী করেছে, 'এ জন্য সব দেশে ও কালে যেটুকু অলঙ্কার বা সুষমা কারুকার্যে দেখা যায় যেটুকুতে শিল্পীর প্রাণস্রোত উদ্বেলিত—সেখানেই শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। যেটুকু নকলমাত্র, যেটুকু দারুভূত ও আড়ষ্ট কঙ্কাল—তাতে হৃদয়স্পর্শ সম্ভব হয় না—মানুষের লীলা তো তাতে ফোটান যায় না। কাজেই যেখানে তা সম্ভব হয় শিল্পীর সার্থকতা সেখানেই।' শ্রীমতী ঘোষালকে সেই হিসেবেই আমি সার্থক বলি। রঙের নির্বাচনে, রেখার বিন্যাসে ছবির বিষয়গুলি যেন অভিনব এক রূপ ধারণ করে। চিত্ররসজ্ঞ জনসাধারণের কাছে সেগুলি তাই অত প্রিয়। বিষয় নির্বাচনে তাঁকে মোটেই মাথা ঘামাতে হয় না। রামায়ণ, মহাভারত ও আমাদের অন্যান্য ধর্মপুস্তক হতেই সাধারণতঃ তিনি বিষয়বস্তু ঠিক করেন। দর্শকদের তাই কোন অসুবিধা হয় না। প্রকৃত সমঝদারের মত তাঁরা প্রদর্শনী গৃহে এক ছবি হতে অন্য ছবিতে চলে যান। বিশেষ কোন রঙকেই তিনি প্রাধান্য দেন না। ছবির মেজাজ বা ভাব সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে কখনও সাদা কখনও লাল. কালো বা নীল রঙের প্রয়োগ করতে তাঁকে দেখা যায়। তাঁর হাতের টানটোনগুলিও খুব পরিণত। প্রত্যেকটি রেখা ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলেছে। গগনেন্দ্র ও নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীরা যে ধারায় দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্যকে ছবির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার মধ্যে পাওয়া যায় ভারতের একান্ত নিজস্ব অভিব্যক্তি, বলা চলে, ঠিক সেই ধারাই অনুসরণ করেছেন শিল্পী শ্রীমতী ঘোষাল। এই প্রসঙ্গে আমার এক প্রশ্নের উত্তরে শিল্পী বললেন, 'যদিও অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীদের কিছু না

কিছু সংস্পর্শে এসেছি কিন্তু তাঁরা এতই বিরাট যে আমার মত এক-জন ক্ষুদ্র শিল্পীর পক্ষে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ কি রকম হওয়া উচিত তা সত্যিই তাঁদের কাছে বসে দেখবার মত ও শেখবার জিনিস।' আমার অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'অত্যাধুনিক চিত্রকলা বলে আজকাল যে ছবি আঁকা হচ্ছে, সত্যি বলতে কি, সে সব আমরা বুঝি না। কিছু কিছু তার মধ্যে রসোত্তীর্ণ ছবি আছে; কিন্তু বেশীর ভাগই আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে।' পুনরায় বললেন, একখানি সার্থক ছবি করতে গেলে যে যত্ন দেওয়া প্রয়োজন, আজকাল অনেকেই তা দেন না। কিছুটা সর্টকাটে সারার চেষ্টা বলে মনে হয়।

এবার এই শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু বলব। ১৯২৬ সালে রাঁচীতে শ্রীমতী নমিতা ঘোষাল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অজিতকুমার সাহা ছিলেন নদীয়ার কুমারখালী জমিদার বংশের সন্তান। ১৯৪০ সালে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সরকারী আর্ট কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৯৪৭ সালে সেখান থেকে উত্তীর্ণ হন। মধ্যে এক বৎসর যুদ্ধের ডামাডোলের দরুণ তাঁর পড়া বন্ধ থাকে। তিনি ছিলেন প্রাচ্য বিভাগের ছাত্রী। সে সময় তিনি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন চক্রবর্তী প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪৭ সালেই তাঁর বিবাহ হয় সুকুমার ঘোষালের সঙ্গে। তার পরের ঘটনা আমি পূর্বেই বলেছি। শ্রীমতী নমিতা ঘোষাল যখনই তাঁর ছবির প্রদর্শনী করেছেন, তখনই তা চিত্ররসজ্ঞ জনসাধারণ ও সমালোচকদের দ্বারা উচ্চ প্রসংশিত হয়েছে। শ্রীমতী ঘোষাল শিল্প সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যে সব সম্মান লাভ করেছেন, নিম্নে তার কিছু বর্ণনা দেওয়া হল :—

১। সরকারী আর্ট কলেজের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালের জন্য বি সি সাহার স্বর্ণপদক লাভ (শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনীর জন্য)।

২। দেওয়াল চিত্র প্রতিযোগিতায় ১৯৪৫ সালে গবর্ণর কেসি কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার অর্জন।

৩। ১৯৪৫ সালে 'আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি' প্রতিযোগিতায় ১০০০ টাকা ও ১০০ টাকার বিশেষ পুরস্কার লাভ।

৪। ১৯৪৬ সালে ন্যাশনাল এ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস কর্তৃক রৌপ্যপদক প্রদান।

৫। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক ২৫০০ টাকার একটি বৃত্তি প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৬। ১৯৫৫ সালে মহিলা চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় এবং তিনি 'স্বর্ণপদক' লাভ করেন।

৭। ১৯৫৭ সালে ঐ একই জায়গায় রৌপ্যপদক ও নগদ ৫০ টাকা পুরস্কারে সম্মানিত হন।

৮। পরবর্তী বৎসরেও ঐ প্রদর্শনীতেই স্বর্ণপদক ও নগদ ১০০ টাকা অর্জন করে আপন মান বাড়াতে সমর্থ হন।

শ্রীমতী নমিতা ঘোষাল বর্তমানে Regional Handicrafts Training Institute for Woman-এ শিল্প শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

যমুনা সেন

বছর দুই আগের একটা শীতের দিন; লাল মাটির পথে হেঁটে এগিয়ে চলেছি, মাঠটা পার হয়ে সামনে শান্তিনিকেতন, পেছনে আমাদের আশ্রয়স্থল—গেষ্ট হাউস।

চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পেছনে তাকালে দেখা যাবে ধূসর মাটির ওপর নতুন নতুন বাড়ী, তালগাছ আর রেল লাইন, সামনে শান্তি-নিকেতনের আমের বন, সে বন ঘন সবুজ।

ছবি আঁকার দেশে এসেছি: তাই মনে হলো, 'মডেল' রেখে যাঁরা আঁকেন—তাঁরা এক স্তরের রূপের পূজারী, আর যাঁরা এই ছড়ানো সৌন্দর্যকে মুঠোয় ভ'রে কুড়িয়ে নেন, তাঁরাও রূপের উপাসক; কিন্তু নেওয়ার জায়গার অনেক পার্থক্য। যার 'তুলনা' করবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু বুঝবার অনুভূতি আছে।

আমরা যেদিনটায় ওখানে পৌঁছেছিলাম, সেদিনটা বুধবার। বুধবারে শান্তিনিকেতন বন্ধ থাকে, তা ছাড়া ৭ই পৌষের মেলাও শেষ হয়েছে। ছেলেমেয়েরা ছুটিতে গেছে বেড়াতে। বিদ্যায়তনগুলির সবই দরজা বন্ধ; আম্রকুঞ্জে আর ছাতিমতলায় তখনও আলিম্পনের মলিন রেখা উৎসবকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এক একবার হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—ঝ'রে যাওয়া পাতাগুলোয় শব্দ শুনছি সেই মর্মরতার।

আমের ডালগুলো সম্পূর্ণ রিক্ত হয়নি এখনও, কিন্তু উত্তরায়ণের পথে শ্যামসমারোহ জেগেছে দেবদারুর রিক্ত শাখায়।

প্রথমে পৌঁছালাম শ্রীযুক্তা যমুনা দেবীর বাড়ীতে ; দেখাও পেলাম তাঁর। চিঠি আগেই দিয়েছিলাম। বললেন—

—"সে চিঠির কী জবাব দেব তাই ভেবেছি এতদিন।"

শ্রীযুক্তা যমুনা দেবী ব'ললেন—

আমার জন্ম ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ; ছাত্রজীবন আরম্ভ হয় এই শান্তিনিকেতনের গণ্ডির মধ্যেই, কিন্তু স্কুল ফাইনাল দেওয়া হয়নি, কারণ ইচ্ছা ছিল না ও লাইনে যাবার। লেখা-পড়ার চেয়ে ঢের বেশী ঝোঁক ছিল নাচ আর ছবি আঁকার দিকে। নাচের মধ্য দিয়ে ছবির ভাষাকে রূপায়িত ক'রে তোলা, আর তাকেই নিত্য নূতনত্বের পথে নিয়ে যাওয়ার দিকে আগ্রহ, একাগ্রতার অন্ত ছিল না। এ সব ছাড়িয়ে জোর করে লেখাপড়ার দিকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও আমার বাবার ছিল না কোনও দিন। তাই তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি আর শিক্ষাআনন্দের সন্ধান দিয়ে চলেছিল আমাদের। এর মধ্য দিয়েই নিজের শিক্ষার পথ বেছে নিয়েছিলাম। এরপর যে যে ছবি এঁকেছি,—তার অধিকাংশই প্রকাশ হয়েছে জয়শ্রী, প্রবাসী আর বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকায়। এ ছাড়াও তখনকার সময়ে কলাভবন থেকে যেখানে যেখানে ছবির প্রদর্শনী হতো নিয়ে যাওয়া হতো,—আমার আঁকা ছবিও যেত সেই সঙ্গে। কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্রীদের আঁকার প্রতিযোগিতায় লেডী অবলা বসু আমাকে প্রথম পুরস্কার দেন একবার ; তারপর প্রায় পনের বছর কলাভবনের সঙ্গে সংযুক্ত আছি। সময় খুব কম, তাই ইচ্ছে থাকলেও ইচ্ছানুযায়ী আর আঁকা হ'য়ে ওঠে না।"

গৌরী ভঞ্জ

যমুনা দেবীর কাছ থেকে যাত্রা সুরু করি আর এক শিল্পীর কাছে, নাম—শ্রীযুক্তা গৌরী দেবী।

শীতের বেলা, – দেখতে দেখতে শেষ হ'য়ে আসছে।

সকালে, কোপাই যাওয়া আসার দীর্ঘ এবং উঁচু নিচু পথে চ'লতে এক পাটি চটি শেষ নিঃশ্বাস টানছে—এখনও তাকে কোনও রকমে টিকিয়ে রেখেছি মাত্র।

এইভাবে চলেও কতকগুলি ঝ'রে পড়া চাঁপা কুড়োবার মোহ সেদিন কাটাতে পারিনি; দিন শেষের আলোর সঙ্গে সেগুলি পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করেছিলাম বর্তমান শিল্পগুরু শ্রীনন্দলালকে,—এ কথা মনে আছে। আর মনে আছে তাঁরই মেয়ে—গৌরী দেবীর আতিথ্য। সে দিনে তাঁর কাছে গিয়ে যা মনে হয়েছিল, আজ তারই এতটুকু প্রকাশ করছি।—

...এ যেন বাংলার সেই মেয়ে,—যে মেয়ে ঘরে ঘরে, আঙিনায় আঙিনায়—ক্ষুধিত, তৃষিত, পথ-শ্রান্তের জন্য—সেবা আর যত্ন দিয়ে আতিথেয়তার আসন পেতে রাখে,—তিনি তাঁদেরই একজন।

উনি ব'লে যান—

—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর মেয়ের মধ্যে আমি প্রথম। ছবি আঁকাও শিখি বাবার কাছে,—আঁকার উৎসাহও পেয়েছি চিরদিন তাঁর কাছ থেকেই।

শ্রেণী হিসাবে শিক্ষা নেওয়ার ওপর আস্থা ছিল না কোনও দিনই, কোনও পরীক্ষাই দেওয়া হয়নি তাই। বারো বছর বয়স থেকেই কলা-ভবনের ছাত্রী হই,—ছবি আঁকাও সুরু করি রীতিমত সেই থেকেই। সব ছবিই একে একে প্রকাশ পায়—প্রবাসী, মানসী, মর্ম্মবাণী, জয়শ্রী আর বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকায়। কলকাতার একাডেমি অব্ ফাইন আর্টস্-এও কয়েকবার আমার আঁকা ছবি গেছে; শিল্পী মহলে সমাদরও লাভ করেছে যথেষ্ট। নাগপুরের একটি প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পাই—'কৃষ্ণলীলা' সম্বন্ধে পর পর কয়েকখানি ছবি এঁকে। আর এই ছবি তিনখানিই দিল্লীতে বেশী দামে বিক্রয় হয়। এখন কলাভবনের কারু-শিল্প বিভাগের কাজে সংযুক্ত থাকায় সময় কম পাই,—উৎসাহও হয়তো কিছু ক'মে এসেছে আঁকবার, তাই নতুন ক'রে ছবি আঁকা আর হয় না,—তবে শান্তিনিকেতনের উৎসব আয়োজনের ভার সাধারণত আমাদের ওপরেই থাকে। ছবি না আঁকলেও এই ধরনের উৎসব-সজ্জা ও রূপ-সজ্জায় প্রচুর আনন্দ পাই,—যেমন আনন্দ পেতাম চারু-শিল্প আর কারু শিল্পের সাধনায়। আমাদের শিল্পচর্চা শুধু ছবি আঁকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তাকে রূপায়িত করতে হয় এই ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে।"

বিদায় নিলাম এবারেও।

বাড়ী থেকে বার হবার পথ এবারও ঢেকেছে সেই ঝরা চাঁপায়: সামনেই লাল মাটির পথ; পথের ওপাশে বড় একটা পুকুরের মত—ওর জলে কাঁপছে অস্তরবির আলো। এটুকু অস্পষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ আবার হেসে উঠবে! উত্তরায়ণের দেবদারুর ফাঁকে চাঁদ দেখা যাবে পূর্ণিমার!

তারই অপেক্ষায় পদক্ষেপ আরও মন্থর হয়ে এলো।

শান্তা দেবী

বাংলা দেশের যে কয়জন মেয়ে ছবি এঁকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন শিল্পীমহলে, শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী তাঁদের একজন।

এঁর আঁকা ছবি বহুদিন ধ'রে প্রবাসী পত্রিকার পৃষ্ঠায় অলঙ্করণ শোভা বৃদ্ধি ক'রে এসেছে, আর সেই সঙ্গে করেছে রূপ-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ। সাধারণ জীবনের তুচ্ছ ঘটনাগুলোকে অসাধারণ ক'রে তুলেছে তাঁর হাল্কা রংয়ের ছোঁয়া, আর রেখাঙ্কনের বলিষ্ঠতা। ছবিকে প্রানবন্ত ক'রে তোলে তাঁর আর একটা দিক, সেটা ভঙ্গি। এই ভঙ্গির সহজ গতি ছন্দোমুখর হ'য়ে উঠেছে তাঁর ছবির বিষয় বস্তুগুলিকে ঘিরে। যেমন, কেউ চলেছে হাটের পথে, কেউ জলের ঢেউ-দোলায় ভাসিয়ে দিচ্ছে তার হাতের প্রদীপ সাজানো ডালা, আবার কেউবা বড় কোনও কিছুকে আয়ত্ব করার বাইরে জেনে,—ফুলগাছের ছোট ডাল ভেঙ্গে ফুল সমেত সাজাচ্ছে ছোট এতটুকু পুঁতে পুঁতে।

এমনি সব ছোটখাট বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন তিনি, কিন্তু জীবনের চঞ্চলতায় সে ছবি যেন আরো সজীব। মনের ওপর স্মৃতির ছবিগুলো ফুটে উঠতে থাকে দেখতে দেখতে।

ছবির জগতে যে দান তিনি দিয়েছেন, তা নষ্ট হবেনা কোন দিন, কারণ ভাবসন্ধানী মন সে রূপ থেকে অপরূপের সন্ধান খুঁজে নেবে নিত্যনূতন পথে তাইতো শিল্পের মৃত্যু নেই। যুগ থেকে যুগান্তরে

শিল্পীর নাম মুছে গেলেও শিল্প বেঁচে থাকে সমস্ত সভ্যতার সাক্ষী হয়ে। শান্তা দেবীর জন্মস্থান ক'লকাতায়। দেশসেবক ও বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ও মনীষী কালিদাস নাগ মহাশয়ের তিনি সহধর্মিণী। ছোট বেলাতেই তাঁকে এলাহবাদ যেতে হয়, কারণ সেখানকার 'কায়স্থ পাঠশালা কলেজ'এর অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে রামানন্দবাবুকে সেখানে যেতে হয়। সেখান থেকেই প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত মাসিক পত্র 'প্রদীপ'। এলাহবাদের কবি ইন্দুভূষণ রায় মহাশয়ের কাছে লেখাপড়া শেখা স্থরু হয় শান্তা দেবীর। ক'লকাতায় ফিরে আসবার পর শান্তা দেবী ও সীতা দেবীকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দেন রামানন্দ বাবু। স্কুলের ড্রইং মাষ্টারের কাছে কালি ও কলমে ছবি আঁকা শেখার সামান্য সুযোগ মেলে শান্তা দেবীর, কিন্তু একটি মাত্র বিড়ালের ছবি নকল করা ছাড়া আঁকার বিদ্যায় সেদিন আর কোনও উন্নতি হয়নি তাঁর, পরে যে কোনও দিন ছবি আঁকবেন—সে কথাও তাই মনে হয়নি।

এরপর বেথুন কলেজ থেকে তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে বি, এ, পাশ করেন ও পদ্মাবতী স্বর্ণপদক পান। ম্যাট্রিক এবং আই, এতেও তিনি স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। বি, এ পাশ করার পর থেকে মন দিলেন সাহিত্য-চর্চায়। 'প্রবাসী'-তেই তাঁর লেখা গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ হত। তিনি ও তাঁর বোন শ্রীযুক্তা সীতা দেবী 'উদ্যানলতা' উপন্যাসখানি 'সংযুক্তা দেবী' নামে প্রবাসীতে প্রকাশ করতেন।

এর কিছুদিন পরে রামানন্দবাবুর ইচ্ছায় নন্দলাল বসুর কাছে তিনি ছবি আঁকা শিখতে স্থরু করেন। বলতে গেলে তাঁরই কাছে হয় ছবি আঁকার হাতেখড়ি। কিন্তু শিক্ষা শেষ না হতেই তাঁকে চলে যেতে হয় শান্তিনিকেতনের বিরাট কাজের মধ্যে। তাই, আবার নতুন করে আঁকা চললো নতুন গুরুর নির্দেশে, এবারকার নির্দেশক অবনীন্দ্রনাথ নিজে।

গুরু বিভিন্ন বটে, কিন্তু নির্দেশ দু'জনেরই এক পথের। ছাত্রছাত্রীকে দু'জনেই ব'লতেন—"প্রকৃতিকে দেখবার মত চোখ তৈরী কর, মনটাকেও চারিদিক থেকে কুড়িয়ে আনো ঐ দেখার মধ্যে "

অবনীন্দ্রনাথ শান্তা দেবীর আঁকা কয়েকটি ছবির প্রশংসা করেছিলেন। এরপর শান্তিনিকেতনে নন্দলালবাবুর কাছে ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকা শিখেছিলেন দু'তিন মাস। শ্রীমতি আঁদ্রে কার্পেলেসের কাছে তেল রংয়ের ছবি আঁকতে শিখলেন। তাঁর দুটি তেলরঙে আঁকা ছবি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রশংসা লাভ করে। সেই দুটি ছবিই গগনবাবুর ইচ্ছায় ইয়োরোপের কোন প্রদর্শনীতে পাঠানো হয়। কিন্তু জাহাজের দুর্ঘটনায় গগনবাবুদের অন্যান্য ছবির সঙ্গে এইগুলিও নষ্ট হয়।

শান্তা দেবীর ভারতীয় পদ্ধতিতে জল রংয়ে আঁকা ছবি কলকাতা, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন প্রভৃতি জায়গায় প্রদর্শনীতে দেওয়া হয়। রেঙ্গুনে তিনি একটি ব্রোঞ্জ পদক পান। ক'লকাতায় তাঁর মেয়ের ছবি ও তাঁর মায়ের ছবি 'রূপম' পত্রিকায় অর্ধেন্দু গাঙ্গুলি মহাশয় কর্তৃক প্রশংসিত হয়।

তাঁর আঁকা, 'বন্যা' ছবিটির প্রশংসা শিল্পী চারুচন্দ্র রায় এবং কোন কোন ছবির প্রশংসা জগদীশচন্দ্র বসু করেন। "পূর্ণিমা" ছবিটির প্রশংসা করেন রবীন্দ্রনাথ। এছাড়া সীতা দেবীর লেখা গল্পেও ছবি এঁকে দেন। ছবি আঁকা ছাড়া সূচের কাজও বহু ক'রেছেন, কিন্তু প্রদর্শনীতে দেননি। সাহিত্যচর্চাতে বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন এবং 'দুহিতা', 'চিরন্তনী', 'জীবনদোলা', 'অলখঝোরা', প্রভৃতি উপন্যাস লেখেন।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন বলেন—"জীবনদোলা" বাংলার একশত শ্রেষ্ঠ বইয়ের মধ্যে একটি। শান্তা দেবীর লেখা 'শিক্ষার-পরীক্ষা' নামে গল্পটি ফরাসী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়। তিনি বহুদিন প্রবাসী পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজও ক'রে এসেছেন। ভারতে ও

ভারতের বাইরে বহু দেশ তিনি ঘুরে এসেছেন। তাঁর স্বামীর সঙ্গে রাজপুতনা, মহেঞ্জোদারো খাইবার পাশ, কাশ্মীর প্রভৃতি জায়গা ঘুরে দেখেছেন। তাঁর এইসকল ভ্রমন কাহিনী প্রবাসীতে প্রকাশ হ'য়েছিল।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী ও মেয়েদের সঙ্গে জাপানে যান। পথে সিংহল, সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতিও কিছু কিছু দেখেন। জাপানে তিনি অনেক মিউজিয়াম, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি দেখে বেড়ান, এছাড়া বিখ্যাত মন্দির ও বুদ্ধমূর্তিগুলিও দেখেন। তিনি বলেন— "জাপানের মত সুন্দর ছবির দেশ কম দেখা যায়।"

জাপান বেড়ানোর কথাও প্রবাসীতে প্রকাশ হয়েছিল। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি 'ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা' নামে একটি বই লেখেন। এই বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ভুবনেশ্বরী স্বর্ণপদক' পায় তিন বছরের মধ্যে মেয়েদের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে। এই বইখানির উচ্চ প্রশংসা করেন অবনীন্দ্রনাথ, সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। কয়েক বছর তিনি সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির 'বঙ্গলক্ষী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৫২ সালের মে মাসে স্বামী ও মেয়েদের নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকা দেখতে যান, সেখানে তাঁর স্বামী অধ্যাপনা করতেন ও মেয়েরা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করতেন।

আমেরিকার মিনেসোটা রাষ্ট্রের দুইটি কলেজে শান্তা দেবী ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ে সতেরটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ শুনতে অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা আসতেন। বুদ্ধের জীবনী, থেরীগাথার কাহিনী ও রামায়ণ মহাভারতের গল্প অনেকে খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। হ্যামলিন ইউনিভারসিটিতে তাঁর ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শান্তা দেবীর প্রবন্ধগুলি টাইপ করে প্রত্যেককে এক এক কপি দেওয়া হয়েছিল।

ছবি অনেক দিন না আঁকলেও মাঝে মাঝে আজোও শিল্পীর আঁকতে ইচ্ছে হয়। মনে হয় নতুন করে শিক্ষানবিশী করতে।

হাসিরাশি দেবী

কিছুতেই যখন ঠিকানাটা জোগাড় করে উঠতে পারছিলাম না তখন সহায় হলেন শিশুসাহিত্যিকা ও আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের শিশু-মহলের পরিচালিকা ইন্দিরা দেবী। তাঁর কাছ থেকে ঠিকানাটা জোগাড় করে যোগাযোগ করলাম বর্ষীয়াণ চিত্রশিল্পী ও সুলেখিকা হাসিরাশি দেবীর সঙ্গে। আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি আমাকে দেখে। বললেন, কি করে পেলেন আমার ঠিকানা। সকলের দৃষ্টির অন্তরালে থাকব বলেই কয়েক বছর হল বাসা বদল করেছি।

বললাম, চোখের আড়াল হলেই কি মনের আড়াল হওয়া যায়। তাইতো এ মনই টেনে এনেছে আপনার কাছে।

হাসি দেবী একটু হেসে বললেন, এবার বলুন, আপনার জিজ্ঞাস্য কি?

আমার আসার উদ্দেশ্য শুনে তিনি কিছুক্ষনের জন্য আত্মনিমগ্ন হলেন।

বুঝলাম ফেলে আসা অতীতের কথা চিন্তা করছেন হাসিরাশি দেবী। খানিকটা সময় পেরিয়ে যাবার পর তিনি যা যা বলে গেলেন ঃ—

১৯১১ সালে গোবরডাঙ্গায় হাসিরাশি দেবীর জন্ম। আইনবিদ্ গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের পাঁচ কন্যা ও এক পুত্রের মধ্যে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ। বাড়ীতে রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ হলেও রাজনীতিকের জীবন তিনি বা বাড়িতে কেউই কোনদিনই যাপন করেন নি। ভাই বোনেদের মধ্যে কেউ বা সাহিত্যিক, কেউ বা ডাক্তার

বা ইঞ্জিনিয়ার। প্রথিতযশা মহিলা উপন্যাসিক প্রভাবতী দেবী (সরস্বতী) তাঁর বোন এবং রবীন্দ্র সাহিত্যে সুপণ্ডিত হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায় তাঁর মামাতো ভাই। হাসিরাশি দেবী কিন্তু সবচেয়ে বেশী সাহায্য ও সুপরামর্শ পেয়েছেন প্রভাবতী দেবী ও তাঁর ভাই সাধনচন্দ্র বন্দোপাধায়ের কাছে। স্কুলের শিক্ষা গ্রহণ করতে কোনদিনই তাঁর মন চাইনি। তাই গোবরডাঙ্গার পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হবার আগেই তিনি ছবির রাজ্যে প্রবেশ করলেন। শুধু প্রবেশ করাই নয়, সে রাজ্য জয়ের নেশায় মেতে উঠলেন। এবং এরই জন্যে একদিকে যেমন উপকরণ সংগ্রহ করতে লাগলেন ভগ্নীপতি প্রশান্তকুমার চক্রবর্ত্তীর কাছ থেকে অন্যদিকে মিতালী পাতানোর জন্য ছুটলেন দিদির সঙ্গে ঠাকুর বাড়ীতে।

কতই বা বয়স তখন তাঁর। আট কি নয়। মেয়েদের সাধারণতঃ পুতুল খেলার বয়স। সে সময়ই তিনি যখন তখন ছুটে চলে যেতেন বাড়ীর ছাদে ছোট যে টিনের ঘরখানা আছে সেখানে। হাতের কাছে যা পেতেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাই নিয়েই ছবি আঁকতে বসতেন। এদিকে বাড়ীর সকলে ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। চারিদিকে যখন খোঁজ খোঁজ রব সেই ছোট্ট মেয়েটি তখন আপন তুলি ও রঙ নিয়ে ভাবছে লাল না কালো না বাদামী কোন্ রঙটা লাগাবে ঐ মুখের ওখানে চামড়াটা যেখানে কুঁচকে রয়েছে। এরই মধ্যে দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর কেটে গেল। তের বছর বয়সে পা দিলেন হাসিরাশি দেবী। বাড়ীর বড় যাঁরা মাথায় হাত পড়ল তাঁদের। আর দেরী নয়, চিন্তিত হয়ে পড়লেন তাঁরা। চারিদিকে পাত্রের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন সকলে। হয়েও গেল সুশীলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এরপর আর কদম কদম নয় জোর কদমে এগিয়ে চললেন হাসি দেবী। সবদিকের পরিবেশ তাঁর এখন অনুকূল, দিদি প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে ঠাকুর বাড়ীতে যেতে শুরু করলেন। বয়স তখন চোদ্দ কি পনের। আদর করে কাছে টেনে নিলেন

রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, ছবির বিষয় শিক্ষা দিতে তাঁরা শুরু করলেন। তাঁদের আদেশ হল, যতপার ছবি এঁকে যাও, প্রয়োজন মত এনে দেখিয়ে নিয়ে যেও। ঠাকুরবাড়ী তখন জমজমাট। একদিকে রবীন্দ্রনাথ অপরদিকে অবনীন্দ্রনাথ। এদিকে কৈশোরের মধুর দিনগুলি পেরিয়ে হাসিরাশি দেবী পা দিলেন যৌবনে। কিন্তু তা হলে কি হয়, এখনকার মত নারীরা তখন স্বাধীন নয়। ভীষণভাবেই পর্দানশীন। কিন্তু শিল্পী মন পর্দার আড়ালে কি আবদ্ধ থাকতে পারে। তাই কখনও স্বামীর সঙ্গে আবার কখনও বা দিদির সঙ্গে চলে যেতেন ঠাকুরবাড়ীতে। ঝুলির মধ্যে থেকে বার করতেন ছবিগুলো। একদিন তো তাঁর একখানা ছবি রবীন্দ্রনাথ ছিঁড়েই ফেলে দিলেন। পরক্ষনেই হাসি দেবীর মাথার একরাশ কালো চুল মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, এটা ঠিক হয়নি, এইভাবে আঁক। হাসি দেবীর আজ সে সব কথা মনে পড়ে। তাঁর মনটা যেন কান্নায় ভরে ওঠে। কি সব মানুষ ছিলেন তাঁরা, কি বিরাট হৃদয়, অপরকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য কি বিপুল আগ্রহ, অপরের প্রতি দরদও তাঁদের যতখানি মমতাও ততখানি। হাসিরাশি দেবী বললেন, আজ জীবনের বাটটি বছর পূর্ণ হয়ে গেল কিন্তু ঐ জিনিসটি আর চোখে পড়ল না। ঐ রকম সব মানুষের সংস্পর্শেও আর আসতে পারলাম না।

বয়স যত তাঁর বাড়তে লাগল তাঁর ছবিও তেমনি ছুটে চলল কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই। প্রদর্শনীর পর প্রদর্শনী হতে লাগল তাঁর ছবির, এল প্রশংসার পর প্রশংসা।

সেই সময় বিধাতাপুরুষ অলক্ষ্যে থেকে ভ্রূ কোঁচকালেন। নদীতে জল একইভাবে যেমন সব সময় প্রবাহিত হয় না, তেমনি মানুষের জীবনও একইভাবে বয় না। তাই সুখের পর দুঃখ, প্রাচুর্যের পর বিপর্যয়। শিল্পীর জীবনেও তাই ঘটল। একমাত্র কন্যা মারা গেল সাত বছর বয়সে। সে শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই হারালেন স্বামীকে। শিল্পীর নিজের জীবনে এবার নেমে এল নিরন্ধ্র,

নিশ্চেদ্র অন্ধকার। মনও চলে না, হাতও চলে না। এইভাবে চলল কিছুকাল, তারপর আবার তুলি চলল, আঁকার নেশা ফিরে এল। ঘুরলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। দুচোখ ভরে দেখলেন দেশের অতুলনীয় শিল্পসম্ভার। নয়ন তৃপ্ত হল, কিন্তু চিত্ত ভরল না। রঙের উপর রঙ বুলিয়ে কুড়িয়ে আনা সৌন্দর্যকে ধরে রাখলেন জাপানী ওয়াশ পদ্ধতিতে। তাঁর ছবির মধ্যে কোথাও ফুটে উঠেছে প্রকৃতির উলঙ্গ রূপ আপন সুষমামণ্ডিত হয়ে, কোথাও বা বুদ্ধের ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি, আবার কোথাও বা যুগলে রাধিকার মূর্তি। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে এই ছবিগুলির জন্যে পুরস্কৃতও হয়েছেন শিল্পী। স্বর্ণপদকের সঙ্গে এসেছে রৌপ্যপদক, স্তুতি এবং প্রশংসা। এতেও শিল্পী তৃপ্ত নন।

১৯৬০ সালে শিল্পীর বয়স যখন প্রায় পঞ্চাশ, মাথার সবগুলি চুলেই যখন রঙ ধরেছে সেই সময় তিনি ভর্তি হলেন সরকারী চারু ও কলা শিল্পালয়ে ছাত্রী হিসেবে। শিখলেন ক্র্যাফট, বাটিক ও মডেল প্রায় দেড় বছর ধরে। হিন্দীও শিখতে শুরু করলেন এরি মধ্যে। কিছুদিন আগে রুমানিয়ার রাষ্ট্রদূত শিল্পীর একখানি ছবি দেখে এতেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে লোক মারফৎ তাঁর কাছে উপহার পাঠিয়েছিলেন। আমার এক প্রশ্নের উত্তরে শিল্পী জানালেন, জলরঙেই তিনি ছবি করতে ভালবাসেন, এবং ছবির মধ্যে জমজমাট রঙ তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। যদিও তিনি পৌরাণিক ছবি আঁকতে ভালবাসেন তবু তার সঙ্গে বর্তমানের সংমিশ্রন ঘটাতে তিনি পছন্দ করেন। কারন, তাঁর মতে ছবিটি তা হলে যুগোপযোগীও যেমন হবে তেমনি পৌরাণিকের প্রতি বর্তমানের বিশ্বাসও নষ্ট হবে না। অবসর পেলে এখনও শিল্পী ছুটে যান প্রকৃতির টানে এদিকে ওদিকে। মুঠো মুঠো সৌন্দর্য দুহাত ভরে কুড়িয়ে নিয়ে আসেন আর বাড়ী এসে তারই রূপ দেন ছবির মধ্যে।

শিল্পী হিসেবেই হাসিরাশি দেবীর যে খ্যাতি তা নয়, বহু বইয়ের প্রচ্ছদপটও অঙ্কিত করেছেন তিনি। বহু পুস্তকও তিনি রচনা করেছেন। কতকগুলির নাম আমি এখানে তুলে দিলামঃ বন্দীবিধাতা, ভোরের

ভৈরবী, রাজকুমার জাগো, রক্তনীলার রক্তরাজি, মানুষের ঘর, দাই, কুশদহের ইতিহাস, আচার্য্য অভেদানন্দ জীবনী ও কবিতার বই বর্ণালী। ছোটদের জন্য বহু কবিতাও লিখেছেন তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। শিল্পী হিসেবে হাসিরাশি দেবী যেমন অনেক ব্যক্তির কাছে ঋনী তেমনি ভারতবর্ষ, জয়শ্রী, মহম্মদী, বিচিত্রা, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি পত্র পত্রিকার কাছেও তিনি কৃতজ্ঞ। ঐ সব কাগজে নিয়মিতভাবে তাঁর ছবি ছাপা হত। আমি নিচে হাসিরাশি দেবীর সম্বন্ধে অবনীন্দ্র-নাথ ও রবীন্দ্রনাথের উক্তি তুলে ধরলাম। এগুলি শিল্পীর খাতায় বিশ্ব-বরেণ্য ঐ দুই মনিষীর স্বহস্তে লিখিত আছে।

"শ্রীমতী হাসিরাশি দেবীর লেখা ছবি গল্প ইত্যাদি আমি বেশ মনোযোগের সঙ্গে দেখি ও পড়ি। ছবি আঁকা ও গল্প লিখতে এঁর বেশ একটু দক্ষতা আছে। এঁর ছবি আমি আমার দু একটা লেখার মধ্যে দেখে প্রথম থেকেই আমি এঁর ছবি আঁকা Book illustration drawingর নিপুনতা ধরতে পেরে সব মাসিক পত্রের মালিকদের জানাই যে এঁর আঁকা Illustration দিয়ে আমার গল্প যেন ছাপা হয়। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে ও সহানুভূতির অভাবে এঁর যদি নৈপুন্য ভাল করে না প্রকাশ হতে পারে তবে সেটা আমাদের দেশের আর্ট স্কুলগুলির পক্ষে বিশেষ অগৌরবের বিষয় হবে। আমি একান্তভাবে শ্রীমতি হাসিরাশি দেবীর লেখা ও ছবির দিক দিয়ে উৎকর্ষ কামনা করি। কিমতি মতি শুভমস্তু।

কলিকাতা
জোড়াসাঁকো — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আগষ্ট ১৯৪১

"লেখা আর আঁকা
তব মন বিহঙ্গের
এই দুটি পাখা
ধরণীর ধূলিপথ ভগ্ন হয় হোক
আকাশে রহিল মুক্ত তব মুক্তিলোক'.

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ
১৩৪২

এ ছাড়াও মুকুল দে, জসীমুদ্দিন, জলধর সেন, সজনীকান্ত দাস, কাজী নজরুল, প্যারিমোহন সেনগুপ্ত, রাজশেখর বসু, অশোকনাথ শাস্ত্রী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পী সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকারেরা হাসিরাশি দেবীর ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর খাতার পাতায় প্রশংসাসূচক বাণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

চিত্রনিভা চৌধুরী

মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে মামার বাড়ীতে ছোট্ট মেয়ে নিভাননী, বারংবার সকলের অগোচরে শান্ত ও বিশাল ছাদে চলে গিয়ে আকুল বিস্ময়ে সুন্দরী তটিনীর দিকে একাকী তাকিয়ে থাকত। অস্ফুট কলকলির মাধুর্য্য দূর থেকে আস্বাদন করা, দিনের বেলায় সঙ্গিনীদের সঙ্গে ব্রত পালন, রূপকথার গল্প শোনা, আর কথকতার অনুষ্ঠান, রামায়ণ, মহাভারত পাঠ এবং ধর্ম্মীয় আচার ও উৎসবে যোগদান করাই ছিল যার অন্যতম কাজ, পরবর্ত্তীকালে সেই মেয়েটিই চিত্রশিল্পের ইতিহাসে যে একজন স্মরণীয় হয়ে উঠবে কে তা জানত। যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বময় পুরুষকে এতদিন দূর হতেই সে পূজো করে এসেছে, একদিন তিনিই যে বন্ধুর মত পাশে এসে অন্তরের স্নেহ ঢেলে দিয়ে তার চিত্রে নানান সুরের সংমিশ্রণ ঘটাবেন, কে তা জানত আগে!

আসলে অঙ্কনের জন্যই সেদিনের সেই মেয়েটির ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং তার নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছিল শৈশবে। চক ও খড়ির সাহায্যে নানা ধরণের আলপনা আঁকা, সুরকি, কাঠকয়লা, চালের গুঁড়ো আর শুকনো বেলপাতার গুঁড়ো মিশিয়ে নানা ধরনের রঙের

কাজ। বিবাহে ও অন্যান্য উৎসবে পিঁড়িতে আলপনা দেওয়া ছিল শৈশবের উৎসাহের অঙ্গ। মা শরৎকুমারী বসুর কাছ হতে শিক্ষা পেয়েছেন সঙ্গীত ও সূচীশিল্পের। এছাড়া পিতা ডাঃ ভগবানচন্দ্র বসুর সঙ্গে মানভূমে থাকাকালীন পাহাড়, ঝর্ণা, আর দীর্ঘ শাল ও মহুয়ার প্রাকৃতিক অনুপম লাবণ্য সম্ভার অনুভব করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পিতার অকালমৃত্যু ঘটায় ওদের কাছে মানস বিচ্ছেদ নিয়ে চাঁদপুরে পিতৃগৃহে চলে আসতে হল কিছুদিন। বিশাল এবং প্রমত্তা মেঘনার রুদ্র সৌন্দর্য্যের সঙ্গে এবার ছেলেবেলাকার গঙ্গার পুরোন মধুর স্মৃতি মিশে একাকার হল। পাখীর কাকলি, জেলেদের ভাটিয়ালি গান নৌকার শুভ্র পালের আন্দোলন, ঢেউয়ের বুকে বিষণ্ণ সন্ধ্যার হলুদ-সিঁদূরের অজস্র মেশামেশি তাঁর অন্তরের সৌন্দর্য-বাতায়নের আবরণ উন্মোচিত করে দিল। সিক্ত কেশবেশে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির নীচে বসে শুনতেন চারিদিকে রহস্যময়ী নবীনা বর্ষার নুপুরনিক্কন। এইভাবে ধীরে ধীরে শিল্পী হবার বাসনা মনের মধ্যে প্রবলভাবে জাগ্রত হল। ১৯২৭ সালে নোয়াখালির জমিদার বংশের সন্তান শ্রীনিরঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর এক নূতন পরিবেশ। স্বামী কি রকম হবে অর্থাৎ তাঁর শিল্প-প্রতিভাকে কতখানি মর্যাদা দেবে, এই ছিল আর পাঁচটি মেয়ের মত তাঁরও মনে আশঙ্কা। কিন্তু ভাগ্য ছিল তাঁর সুপ্রসন্ন, কারণ, স্বামী শুধু উৎসাহিতই করলেন না. বরং পর বৎসরেই তাঁকে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন ছাত্রী হিসাবে।

শরতের সে এক ধূসর বিকেল। শান্তিনিকেতনের স্বপ্নরাজ্যে পা রাখলেন এই সম্ভাবনাময়ী নারী। উত্তেজনা আর ভয়ে তাঁর তনুলতা তখন কম্পিত। এই অবস্থার উপর আবরন টানার জন্যই বোধ হয় তিনি তাঁর ঘোমটাকে দীর্ঘতর করে দিলেন, কিন্তু রেহাই পেলেন না। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাট্টা করে বললেন, ঘোমটা দিতে নয়, এখানে এসেছো তোমার শিল্পপ্রতিভার আবরণ উন্মোচন করতে। উত্তরায়নের কোণারকে নির্দ্দিষ্ট হল তাঁর আবাস। এখানে চেয়ে দেখার জন্য

তাঁর গঙ্গা বা মেঘনা ছিল না, কিন্তু এখানে চারিদিকে ঘিরে ছিল তাঁর সঙ্গীতের সুর আর ধূ ধূ মাঠ। শীঘ্রই এই নবাগতাটি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং যাতে করে মেয়েটি আরো সহজ হয়ে উঠতে পারে তারি জন্য তিনি তাঁকে আশার বাণী শোনাতেন, তোমার ক্ষমতা আছে, তুমি পারবে। তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি।

এই ভাবেই তাঁর শান্তিনিকেতনের সোনার দিনগুলির সূত্রপাত। প্রায়ই দুপুরবেলায় তিনি কবির কুটিরের দিকে পা বাড়াতেন এবং কবি কণ্ঠের আবৃত্তি ও পাঠ শুনতেন। এই সময় তাঁর অঙ্কিত ছবি দেখে কবি তাঁকে নূতন নাম দিলেন 'চিত্রনিভা'। এই নামেই তিনি আজ পরিচিতা। রসজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে কবি চিত্রকাব্য ও অন্যান্য শিল্পের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। এই সব আলোচনার খুঁটিনাটি থেকে চিত্রনিভা পরবর্তী জীবনের নানান খোরাক যোগাড় করেন। ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে দেশ যখন উত্তাল, তখন রবীন্দ্রনাথই তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট করলেন গ্রামসেবার পবিত্র দায়িত্ব। নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদের মধ্যে তখন কাজ করাটাই তিনি শিল্প কর্মের আর এক ক্ষেত্র বলে মনে করলেন।

কবি কিন্তু তাঁর শিল্পের গুরু ছিলেন না। কলাভবনে তাঁর শিক্ষক ছিলেন 'মাষ্টারমশাই'। আচার্য নন্দলাল বসু, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনোদবিহারী এবং সুরেন্দ্রনাথ করেরও সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। চিত্রকলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন সেনের উপদেশগুলি আজও তাঁর কানে বাজে। তখনকার শান্তিনিকেতনের পরিবেশ সম্বন্ধে চিত্রনিভা বললেন, "সেখানে বিধিনিষেধের কোন কড়াকড়ি ছিল না। ইচ্ছেমত সঙ্গীত ভবনে গিয়ে সঙ্গীতচর্চাও করতাম, দুটুজি, দীনেন্দ্রনাথ আমাকে গণিত শেখাতেন। মোট কথা তখনকার পরিবেশটাই ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। স্বর্ণকণ্ঠ কবি তাঁর নতুন কোন গানের সুর সংযোজনা করছেন উত্তরায়নে বসে। আমাদের

ডাকলেন এবং সকলের সামনে তা পরিবেশন করলেন। সে সব দিন জীবনে কখনও ভোলার নয়।" শান্তিনিকেতনে পাঁচ বৎসরের শিক্ষাসূচী সমাপ্ত করে চিত্রনিভা ফিরে এলেন নোয়াখালিতে। সেখানে তিনি তাঁর নবলব্ধ শিক্ষাকে কাজে লাগালেন গ্রামবাসীদের জন্য একটা স্কুল খুলে। আলপনা দেওয়া থেকে আরম্ভ করে চামড়ার কাজ, এমব্রয়ডারী বাটিকের কাজ তিনি অতি যত্নসহকারে শেখাতে শুরু করলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। আচার্য তাঁকে কলাভবনের সকল কর্মসূচী অনুষ্ঠান প্রভৃতির খবর নিয়মিত জানাতেন। ঢাকায় যে বিরাট ফ্রেসকো অঙ্কনের কাজ এই সময় চিত্রনিভা গ্রহন করেন, শান্তিনিকেতন থেকে নন্দলাল বসুই পত্রে সে সম্বন্ধে তাঁকে নির্দেশ দিতেন। এক বছরের জন্য চিত্রনিভা কলাভবনের শিক্ষিকা হিসাবে যে কাজ করেছিলেন, তা যে কোন মহিলা শিল্পীর পক্ষে গৌরবের অঙ্গ।

রঙীন আকাশের উজ্জ্বল সৌন্দর্য, দিবসসন্ধ্যার গান এবং গ্রামবাসীর উৎসব ও জীবনের কাব্যকে রূপ দেওয়ার ঝোঁক ছিল চিত্রনিভার অসাধারন। তাঁর আঁকা দেওয়াল চিত্রে সুখশান্তিময় মানব জীবনের উজ্জ্বল চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

তাঁর প্রথম জীবনে আঁকা গ্রাম্য জীবনের ছবি এবং পরবর্ত্তীকালে শান্তিনিকেতনে আঁকা সাঁওতালদের জীবনযাত্রার ছবি চিত্রিত করার মাধ্যমে সেই একই জীবনের ছবি দেখতে পাই। বললে অতিশয়োক্তি হবে না ফ্রেসকো কাজে এত বেশী বাংলার গ্রাম্য জীবনের ছবি আর কারো চিত্রে বোধ হয় ফুটে ওঠেনি। তাঁর অঙ্কিত চিত্র পূব ও পশ্চিম দুই অংশেরই চিরন্তন সম্পদ। দেশ বিভাগের পরে চিত্রনিভা নোয়াখালি থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন এবং হঠাৎই বলা চলে, তিনি প্রতিকৃতি অঙ্কনশিল্পী হয়ে পড়লেন। শান্তিনিকেতনে কার কাছে ঋণী, এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করাতে শিল্পী চিত্রনিভা বললেন, "বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে আমি ঋণী—কারো কাছে গান, কারো

কাছে চিত্র এবং শেষে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। কারণ তিনিই শান্তি-নিকেতনে যে সমস্ত পৃথিবীখ্যাত লোকেরা আসতেন তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতেন। একবার তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজঘাটে গান্ধী মণ্ডপে আলপনা দেওয়ার জন্য ডাকা হয় এবং সে কাজ তিনি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। জগদীশচন্দ্র বসু শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে ডাকা হয়েছিল আলপনা দেওয়ার জন্য। শ্রীমতী চিত্রনিভা শুধু জড় প্রকৃতিতেই আনন্দ খুঁজে পেতেন, তা নয়, মানুষ এবং তার পরিবেশেরও অপুর্ব মিশ্রণ দেখা যায় তাঁর অঙ্কনের সর্বত্র। তাঁর শিল্পে আছে নদী, গ্রাম, প্রান্তর, দেওয়ালে জড়ানো লতা প্রভৃতি। হঠাৎ চমক লাগানোর মত কিছু তাঁর শিল্পে নেই। আছে সহজ অকৃত্রিম এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত কাব্যময়তা। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে আর্টিষ্ট্রি হাউসে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের তরফ হতে তাঁর ছবির যে একক প্রদর্শনী হয় তা বহু সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শান্তিনিকেতনের এদিক ওদিক ঘুরলেও তাঁর অঙ্কিত বহু চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। বর্তমানে চিত্রনিভা উত্তর কলিকাতায় বাস করছেন। লেডী অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত বাণী ভবনের তিনি শিল্প নির্দ্দেশিকা। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে কন্যা চিত্রলেখা এম. এস. সি. পাশ করে গবেষণা কার্যে রত আছেন এবং সিটি কলেজে অধ্যাপনা করছেন। শুধু তাই নয়, তিনি আকাশবাণীরও একজন নিয়মিত শিল্পী। নৃত্যে এবং চিত্রাঙ্কণেও তাঁর অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পেলাম। তাঁকে উদ্দেশ করে যাঁরা যা বলেছিলেন তাদের কয়েক জনের উক্তি থেকেই চিত্রনিভার শিল্পী মন ও তাঁর বিরাট শিল্প প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'অক্ষয় অমর হোক তোমার সাধনা, বর্ণ রেখা তব নৈবেদ্য, চিত্রে উঠুক ফুটি তার আরাধনা।' প্রভাতকুমার বলেছিলেন, 'গুরুদেব তোমার নাম দিয়েছিলেন চিত্রনিভা। আমি গুরুর চেলা, তোমায় তার থেকে কি আর ভাল নাম দেবো। নাম সার্থক করেছ কবির আশীর্বাদ পেয়ে।' প্রতিমা দেবী বলেছিলেন

—'চিত্রনিভা ছিলেন সত্যিকার শিল্প সাধক। তাঁর অধ্যবসায়, যত্ন ও চিত্রবিদ্যার প্রতি অনুরাগ সকল মহিলা ছাত্রীর অনুকরণীয়।' আচার্য নন্দলাল বলেছিলেন, I am very much impressed some of her (Chitraniva) details studies of Santiniketan Ashram life. Fair portraits of many persons in pencils."
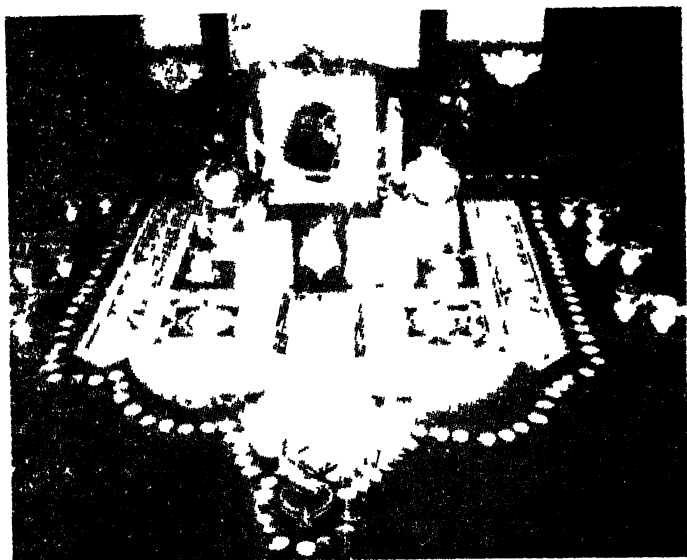
চিত্রনিভা চৌধুরী অঙ্কিত একটি 'আলপনা'

মীরা মুখোপাধ্যায়

শিল্পী মহলে যাতায়াত শুরু হবার পর থেকে, বলা চলে, তারও বহু আগে থাকতে বহু শিল্পী মহিলার সঙ্গেই পরিচিত হয়েছি। দেখেছি তাদের মধ্যে শিল্পী মন, শিল্পী মেজাজ। দেখেছি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য কি অসীম আগ্রহ তাঁদের মধ্যে, কি পরিমান অধ্যবসায়। কিন্তু এবার যাঁর কথা বলব তিনি যেন মনে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন মনের, ভিন্ন ধরণের। খালি চোখে দেখলে হঠাৎ বোঝা যায় না, কিন্তু মিশলে পরে ধরা পড়ে যান। তুলির উপর অসাধারণ দখল, হাতের নানান ধরণের কাজ, সর্বোপরি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য বুকে দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে তিনি তথ্যানুসন্ধান করে চলেছেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। শিল্পের প্রতি দরদ আছে। আছে ক্ষমতা। কিন্তু আত্মপ্রচারের কোন রকম বাসনা নেই মনের মধ্যে।

পথ চলতি বাউলের গান কারো মনকে হয়তো দোলা দিয়ে যায়, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পথিক তার পাশটিতে। তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে অন্তরের শ্রদ্ধা জানায় পথিক। কেউ বা আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু বাউলের কি এসে যায় তাতে? একতারা তার হাতে বেজেই চলে। এবার যার কথা লিখছি সেই মীরা মুখোপাধ্যায়ও যেন ঐ একই প্রকৃতির। যাঁরা তাঁর ছবিকে ভালবাসেন বাড়ী এসে তাঁরা শ্রদ্ধা জানিয়ে যান, তাইতেই যেন শিল্পীর পরম তৃপ্তি, চরম আনন্দ। সমালোচকদের নির্দ্দেশও মানতে তিনি রাজী। কারণ তাঁরাই শিল্পীদের সঠিক পথ নির্ধারণ করতে অনেক সময় নির্দ্দেশ দেন, কিন্তু আমাদের দেশে সব সময় তা যথার্থ হয় না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন মীরা দেবী। তবুও তাঁদের সকলকার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে, কারণ তিনি মনে করেন, শিল্প, শিল্পী এবং শিল্প সমালোচক এই তিনজনের মধ্যে পরস্পর কোন

বিরোধ নেই। এবারে এই শিল্পীর জীবন কি ভাবে শুরু হল বলা যাক্। তাঁরই কথা, বাড়ীর চাকরের হাতেই আমার শিল্পী জীবনের হাতে খড়ি। যে নেপালী দারোয়ানটি বাড়ীতে ছিল তাকে দেখতাম কাজের অবসরে ছবি আঁকতে। সেই দেখেই অতি অল্প বয়সেই আমার শিল্পী হবার বাসনা জাগল। এছাড়া বাড়ীর বাইরে দেখতাম প্রায়ই একটি লোক ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে সদর রাস্তার উপর দিয়ে চলে যেত, আর কেউ কিছু কিনতে চাইলে ঝোলার ভিতর হতে ছোট ছোট কাঠ বার করে স্নন্দর সুন্দর ঠাকুর তৈরী করত। আমি মনে মনে শিল্পী হওয়ার শপথ গ্রহণ করলাম তাদের ঐসব ছোট অথচ স্নন্দর শিল্প কর্ম দেখে।

শ্রীমতী মুখার্জ্জী প্রচার মুখাপেক্ষী নন এবং তাই যখন আমি তাঁর কাছে যাবার প্রস্তাব করলাম তিনি খুবই বিনয়ের সহিত আমাকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার তাগিদার কাছে তিনি আর পেরে উঠলেন না। তাঁর গোপন অনেক কিছু জেনে ফেললাম। শ্রীমতী মুখার্জ্জী ১৯২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন কলিকাতার এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে। পিতা দ্বিজেন্দ্রমোহন মুখার্জ্জী লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, ছিলেন। মা বীণাপাণি মুখার্জ্জী। চার বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠা। সকলের আদরও তাই তাঁর উপর ছিল একটু বেশী পরিমাণেই। পরিবারের সকলের মধ্যেই ছিল শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে বহুবার স্থান পালটাতে হয়েছে। ১৯৩৮ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের শিল্পী কালীপদ ঘোষালের তত্বাবধানে তিনি শিক্ষানবিশী করেন। তাঁর প্রথম চিত্র প্রদর্শিত হয় ১৯৪১ সালে কলকাতায় বাৎসরিক এক প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীতে প্রাচ্যরীতির কাজের জন্য তিনি প্রথম পুরস্কারে অলঙ্কৃত হন। ভারত সরকারের দিল্লী পলিটেকনিকে তিনি ভর্ত্তি হন ১৯৪৬ সালে এবং সেখান হতে ১৯৫১ সালে পাশ করে বেরিয়ে এলেন। এরি মধ্যে ১৯৪৭ সালে দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্ট এণ্ড ক্র্যাফট কতৃক আয়োজিত একটি

প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্র প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৪৮ সালে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানে গ্রাফিকের কাজের জন্যও প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫০ সালে দিল্লী পলিটেকনিকের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে কম্পোজিসান, লাইফ ড্রইং এবং ষ্টীল লাইফের জন্য তিনি তিন তিনটি প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন। এর পর বহু জায়গাতেই তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছে এবং সুনামও অর্জ্জন করেছেন প্রচুর। ১৯৫২ সালে তিনি ভারত সরকারের বৃত্তি লাভ করে জার্ম্মানীতে যান এবং সেখানকার মিউনিক এ্যাকাডেমির অধ্যাপক এরিক গ্লিটি ও কিরচশরের অধীনে শিল্প শিক্ষা করেন। অধ্যাপক টনি খ্যাডলারের অধীনে তিনি ভাস্কর্যের নানান দিক সম্বন্ধে জ্ঞাত হন। তা ছাড়া বিদেশে থাকাকালীন বহু সুধীজনের তিনি যেমন সংস্পর্শে এসেছেন তেমনি পিকাসো প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের শিল্প প্রদর্শনী দেখার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছে। কথায় কথায় তিনি বললেন—দেশের শিল্পাত্মার সঙ্গে শিল্পীর নাড়ীর যোগ না ঘটলে এ ধরণের শিল্প সৃষ্টি করা কখনই সম্ভব হত না। অতি সাধারণ চিত্র, অথচ তারি মধ্যে রূপ পেয়েছে দেশের খুঁটিনাটি কত কি।

দেশে ফিরে এলেন তিনি ১৯৫৭ সালে। কিছুদিন উদয় ভিলাতে কাজ করার পর গেলেন দার্জ্জিলিং-এর ডার্ড হিল স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে। এরপর তিনি বহু জায়গায় ঘুরেছেন শিক্ষকতার কাজ নিয়ে। ছবিও যেমন এঁকেছেন প্রচুর, ভাস্কর্যের মধ্য দিয়েও তেমনি নিজেকে বিকশিত করে তুলেছেন। তাঁর চিত্রশিল্পে আকৃষ্ট হয়ে পশ্চিমের বহু কলা সমালোচক তাঁকে প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছেন। এ দেশেও অনেকেই এক বাক্যে বলেছেন।

In Sreemati Meera we have an artist of vigour, vision and considerable promise.

বিষয় নির্বাচনে শিল্পী মীরা দেবীর মানব প্রেমের প্রশংসা না করে পারা যায় না। কোন বিষয়কে চিত্রায়িত করতে আত্মিক সংবেদনশীলতার

দাবী রাখে। নিসর্গ চিত্রেও তাঁর হাত অসাধারণ। শিল্পীর জীবনবোধ ও উপলব্ধি এবং নানা রঙের যথাযথ ও পরিমিত ব্যবহার শিল্পীকে সার্থক করে তুলেছে। পাশ্চাত্যে বহু জায়গা ভ্রমণ করে এলেও তাঁর চিত্রে লাগেনি তার ঢেউ। স্বদেশের মাটির সঙ্গে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে চলেছেন মীরা দেবী। শিল্পকে শিল্পী যে জীবনের পরম সাধনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তা তাঁর চিত্রদর্শনে স্পষ্টই ধরা পড়ে। শ্রীমতী মুখার্জ্জী জলরঙ, তেলরঙ এবং টেম্পেরা ও কখনও ওয়াশ পদ্ধতিতে ছবি এঁকে থাকেন। বিশেষ কোন রঙের উপর তাঁর কোন মমতা নেই এবং ছবির প্রকার ভেদে যে রঙেরও তারতম্য হয়, সে কথারও উল্লেখ করলেন। তাঁর শিল্পীজীবনে তিনি অনেকের কাছেই ঋণী তবে শ্রীপ্রভাসরঞ্জন সেনের দান ভোলার মত নয় সে কথা অকপটচিত্তেই তিনি স্বীকার করলেন।

মীরা দেবীর বাড়ীর অপরাপর ভাই বোনেরাও অঙ্কন শিল্পের প্রতি অনুরাগী। শ্রীমতী মুখার্জ্জীকে কঠোর জীবন সংগ্রামেও কয়েকবার অবতীর্ণ হতে হয়েছে, কিন্তু পরাজিত তিনি কখনই হননি, অবশ্য তার জন্য তাঁকে হয়তো অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়েছে; কিন্তু হাসিমুখে অদৃষ্টকে বরণ করে নিয়ে চিত্রকলার সাধনায় তিনি নিজেকে ব্যাপ্ত করে রেখেছেন। বর্তমানে তিনি এক অসাধারণ কাজে হাত দিয়েছেন এবং তার জন্য তাঁকে ভারতের বহু জায়গায় ঘুরতে হচ্ছে, দেখতে হচ্ছে, জানতে হচ্ছে অনেক কিছুই। তাতে জয়যুক্ত হলে আমার মনে হয়, ঐই শিল্পে অগ্রণী অনেকেরই উপকার সাধিত হবে।

কমলা রায় চৌধুরী

শিল্পীর মাধ্যমেই শিল্পের যেমন প্রকাশ, তেমনি শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ পায় একটা সমগ্র দেশ বা জাতির ইতিহাস। ইতিহাস বিকৃত হতে পারে কিন্তু শিল্প কোনদিন বিকৃত হয় না। সমগ্র গ্রীস দেশের অতীত শিল্পের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তা হলে তৎকালীন ইতিহাস আমরা তারি মধ্য দিয়ে পুরোপুরি দেখতে পাই। শুধু গ্রীস বা ইতালী কেন, ভারতের প্রাচীন মন্দির অথবা গুহাভ্যন্তরের চিত্রের মাধ্যমে আমরা তার প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে পাই। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে শিল্পের বা সাহিত্যেরও অনেক সময়ই পরিবর্তন ঘটে, নানান আবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলে চিত্রশিল্পের পরীক্ষা নিরীক্ষা। ভাবের, বিন্যাসের বা আঙ্গিকের দিক থেকে যেমন মত ও পথের পরিবর্তন ঘটে তেমনি অঙ্কনরীতির ধারারও হয় পরিবর্তন। কেউ বলেছেন, প্রকৃতির অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে তার ভেতরকার লুকানো ঐশ্বর্য দেখান হল আর্টের লক্ষ্য, কেউ বা বলেন, বস্তুর কোনো অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত সৌন্দর্যের দিকে হৃদয়কে সচেতন করার নামই আর্ট। Zola বলেছেন, আর্ট হচ্ছে নিজের মেজাজের ভিতর দিয়ে সংসারকে দেখা এবং আঁকা। Goethe এক জায়গায় বলেছেন, আর্টিস্ট প্রাণের সমগ্রতার ভিতর দিয়ে জগতের সঙ্গে সামাজিকতা করতে চায়—সৃষ্টিতে এ সম্পূর্ণতা সে পায় না। আসলে জাতির হৃদয়ই যে মহাবহ্নি তারই সংস্পর্শে সমগ্র আর্ট চিত্র ও কাব্য সংস্কারপুত হয়, একথা বহুজনেই বলে গেছেন কিন্তু ইউরোপে Tolstoy আসার পর থেকে সব কিছুর মোড় ঘুরে গেছে। তিনি সকল আর্টকেই তিরস্কার করেছেন। তাঁর মতে প্রকৃত আর্ট বিশ্বজনীন। যে আর্ট বহুকে এক করে তাই হচ্ছে ভাল আর্ট এই বহু হচ্ছে কোন

নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী নয়, সমগ্র পৃথিবীর জনতা। টলস্টয় এই আর্টকেই যথার্থ খৃষ্ঠীয় আর্ট বলেছেন, কারণ তা ভগবানের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা মানুষের ভিতর দ্বন্দ্বের বীজ বপন করবে তাই হচ্ছে খারাপ আর্ট। শিল্পী কমলা রায়চৌধুরীর অঙ্কন রীতির বিষয়বস্তু শুধু দেশের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার পরিব্যাপ্তি দেশের বাইরেও। তাই তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে মূর্ত্তিও পবিত্র যীশু দুইই স্থান পেয়েছে। তাঁর অঙ্কন রীতির পদ্ধতিও একটু ভিন্ন জাতের। পশ্চিম ইউরোপে

বিশ শতকের মধ্যভাগে যে সব শিল্পী জন্মগ্রহন করেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই অঙ্কন রীতির নানারকম পরিবর্তন ঘটাতে থাকেন। নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে তাঁরা আধুনিক চিত্রে বহু সমস্যার সৃষ্টি করলেন। এঁদের মধ্যে নাম করা যায় সেজান, মাতিস,

পিকাশো ইত্যাদী। এঁরা কেউই পুরাণো পদ্ধতি অনুসরণ করলেন না বরং সেগুলি দুহাতে ঠেলে নিরাসক্ত মনে মনের মত করে ছবি আঁকলেন। এই সময় প্রচলিত হয় কিউবিজম প্রথায় ছবি আঁকার। সেজান যার জনক। অবশ্য পিকাশো পরে এই প্রথার আরো উৎকর্ষ সাধন করেন। এই প্রথায় ছবি এঁকেই তিনি পৃথিবীখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু এতবড় শিল্পী হয়েও তিনি আবেগকে বিসর্জন দেননি বা যুগোপযোগী ছবি আঁকা হতেও বিরত হননি। কিউবিজম প্রথা চালু হবার পর আমাদের দেশেও তার ঢেউ এসে লাগল এবং যে ক'জন শিল্পী ঐ প্রথায় ছবি আঁকতে শুরু করলেন শ্রীমতী চৌধুরী তাঁদের মধ্যে একজন। এখানে বলে রাখি এই কিউবিজমেই প্রথম ছবি, চট, রং ও রেখা তার আপন নিজস্ব সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হলো। শুধু চোখে যা দেখছি তাই আঁকার রীতি গেল পাল্টে। ছবির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, রং রেখার মধ্যে মনের গভীরত্ব কায়েম হয়ে বসলো। এই রীতি সব প্রাকৃত, স্বাভাবিক বস্তুকে জ্যামিতিক রেখায় আর কোণে টুকরো টুকরো করে ফেললো। শ্রীমতী চৌধুরী বহু জায়গা ঘুরে এই প্রথাটি যে ভালভাবেই আয়ত্তে এনেছেন তা তাঁর শিল্পকর্ম দেখলেই উপলব্ধি করতে পারা যায়। formকে বাদ দিয়ে যে রসোত্তীর্ণ আর্ট সৃষ্টি করা যায় না, সে সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন। তাঁর অঙ্কন কৌশল, প্রকাশ ভঙ্গী এবং ভাব প্রশংসার যোগ্য।

কমলা রায়চৌধুরী ১৯২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা প্রমিলা দেবী ও পিতা মণীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর দুই পুত্র ও একমাত্র কন্যার মধ্যে তিনি বড়। আদি বাড়ী তাঁদের রংপুর জেলায়। পিতা স্থানীয় জমিদার ছিলেন, কিন্তু বঙ্গ ভঙ্গের সময় দেশ ছেড়ে তাদের কলকাতায় বসবাস করতে হয়। প্রথমে Diocesan ও পরে Loreto স্কুল থেকে পাশ করার পর ১৯৪৩ সালে ভর্তি হলেন সরকারী চারু ও কলা বিদ্যালয়ে। ১৯৪৮ সালে ফাইন আর্টে ডিগ্রী নিয়ে সেখান থেকে

বেরিয়ে আসার পর শিল্পকলা সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন। প্রথমে লণ্ডন এবং পরে ইটালী, ফ্রান্স এবং সব শেষে প্যারিস ভ্রমণ করে ১৯৫৩ সালে দেশে ফিরে এলেন। বিদেশে থাকাকালীন তিনি প্রত্যেকটি দেশের অত্যাধুনিক শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সহকারে মিশে নব অর্জিত অভিজ্ঞতায় পূর্ণ করলেন আপন হৃদয় ভাণ্ডার। ফর্মের ভাঙাচুরা, রেখার নিষ্ঠুর সংক্ষেপীকরণ এবং রঙের পরিমিত ব্যবহার যা ইউরোপের শক্তিশালী শিল্পীদের মধ্যে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেছে তাই স্বচক্ষে দর্শন করলেন।

চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে শিল্পীর নিজস্ব মত হচ্ছে যুগের বা সমাজের প্রতিচ্ছবিই যে শিল্পীদের শিল্পকলায় সব সময় ফুটে উঠবে এমন কোন নিয়ম বা বাধ্যবাধকতা নেই। তবে তার মধ্যে যদি কোন উৎকৃষ্টতা বা সৌন্দর্য থাকে তা নিশ্চয়ই শিল্প হওয়া উচিত। তবে সুন্দরের মাত্রাবোধ আপেক্ষিক, একজনের কাছে যা সুন্দর অপরজনের কাছে হয়ত তার কোন মূল্য নেই। শিল্পীদের রুচি মেজাজ পরিবর্তনশীল হলেও অঙ্কনরীতির বা প্রথার একটা দায়িত্ব আছে। ছবি আঁকার জন্য নির্জন পরিবেশই শিল্পী হিসেবে শ্রীমতী রায়চৌধুরীর কাম্য তবে 'মুড' এর বশবর্তী হয়ে তিনি ছবি আঁকেন না বরং অন্তরের তাগিদেই তিনি তা করে থাকেন।

বর্তমানে শ্রীমতী রায়চৌধুরী লরেটো মালটিপারপাশ স্কুলে কর্মরত।

করুণা সাহা

সাহিত্যিক প্রতিভা ছাড়াও টলষ্টয় যে একজন সৌখীন শিল্পী হিসেবেও খ্যাত ছিলেন সে কথা শিল্পরসজ্ঞ কোন ব্যক্তিরই অজানা নেই। ছোটদের জন্য জুলেভার্ণের কাহিনী চিত্রিত করেছিলেন তিনি। এবং এঁকেছিলেন রুশ ছেলেমেয়েদের জন্য একখানি বর্ণমালার বইও। বড়দের জন্য যে ছবিগুলি এঁকেছিলেন তার সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছিলেন, এগুলি আমার জীবন থেকে নেওয়া এবং জীবন দিয়ে আঁকা। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'বাস্তবকে কল্পনা থেকে কতখানি সরালে কিম্বা কল্পনাকে বাস্তবের থেকে কতটা হটিয়ে নিলে art হয় এ তত্ত্বের মীমাংসা হওয়া শক্ত, কিন্তু কল্পনায় যাহা বাস্তব, চোখে দেখা জগতের সঙ্গে মনে-ভাবা জগতের মিলন না হলে art হবার জো নেই। অপর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, প্রথমে আপন করে নেওয়া ভাব পরে সেটিকে সকলের আপন করে' দেওয়া ভাবযুক্ত করাটাই প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্টের কৌশল। করুণা সাহার অঙ্কিত চিত্রাবলীর মধ্যে উপরিউক্ত ভাবগুলি যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান তা সকল গুণীজন স্বীকার করেছেন। সত্যিকারের শিল্পী যে কোন বস্তুর বহিরাকৃতিকে হুবহু অনুসরণ করেন না, বরং সেই বস্তুর বিশেষ ভাবটিকেই ফুটিয়ে তুলতে চান তা শ্রীমতী সাহার চিত্রগুলি অনুধাবন করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। শুধু তাই নয় তিনি তাঁর অন্তরের ভাবটিকে গভীর প্রেরণা ও বলিষ্ঠ উপলব্ধি শক্তির দ্বারা চিত্রে রূপ দিতে চেষ্টা করেন যার জন্য তাঁর চিত্র প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। নানান আঙ্গিকে, নানান ভাবে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর ছবির পরিকল্পনা করে থাকলেও তাঁর ছবির কোন জায়গায় জড়তা নেই বা তা সাধারণ দর্শকের কাছে কখনও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। তাই চিত্রাঙ্কণ সম্বন্ধে শ্রীমতী

সাহার ব্যক্তিগত মতামত ও তাঁর পরিচিতি জানার জন্য একদিন তাঁর টালিগঞ্জস্থ বাসভবনে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি আমাকে তাঁর নিজস্ব ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আঁকবার সাজ-সরঞ্জামে পরিপূর্ণ ঘরখানির একদিকে রয়েছে চিত্রাঙ্কণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বই ও দেয়ালে রয়েছে নিজের আঁকা কয়েকখানি তৈলচিত্র।

১৯৩৯ সালে বেলতলা গার্লস হাইস্কুল হতে ম্যাট্রিক পাশ করে শ্রীমতী সাহা Art College-এ ভর্তি হলেন। ঘরে বসে অবশ্য তাঁর আগে তিনি প্রখ্যাত শিল্পী অর্দ্ধেন্দু ব্যানার্জ্জীর কাছে চিত্র শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, ঐ সালেই আর্ট কলেজে প্রথম মেয়েদের জন্য ক্লাশ খোলা হয় এবং করুণা দেবী হচ্ছেন সেই প্রথম ব্যাচের একজন। কিন্তু এক নাগাড়ে পড়া আর তার হল না। ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেওয়ার দরুণ কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ কর্তৃক তিনি বহিস্কৃত হন। ঐ বছরই আবার তিনি আশুতোষ কলেজে I. Sc. ক্লাসে ভর্ত্তি হলেন। কিন্তু মন পড়ে রইল চৌরঙ্গীর সেই বড় বাড়ীটার দিকে যেখান থেকে তিনি বহিস্কৃত হয়েছিলেন, কারণ যে রঙ তার দুই চোখকে একদিন ভরিয়ে দিয়েছিল, কলেজে ভর্তি হবার পর তাই তাঁর হৃদয়কেও মথিত করে তুলেছিল। সেই আকর্ষণে তিনি ১৯৪৬ সালে পুনরায় এসে ভর্তি হলেন আর্ট কলেজে এবং ১৯৪৯ সালে ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী হিসেবে কলেজে তাঁর খুবই খ্যাতি ছিল। পাশ করার পর দিলীপ দাশগুপ্তের ষ্টুডিওতে কাজ করতে লাগলেন। শ্রীমতী সাহার জীবনে সবচেয়ে বড় কীর্তি ভারত সরকার কর্তৃক তিন আনা মূল্যের ডাকটিকিটের উপর তাঁর অঙ্কিত একটি চিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত করা এবং তার জন্য তিনি সরকার কর্তৃক পুরস্কৃতও হয়েছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর জীবনে গর্ব করার মত আরো অনেক জিনিষই আছে। বিখ্যাত ফরাসী চিত্র-পরিচালক Jean Renior তাঁর The River চিত্রের কয়েকটি দৃশ্য

পরিকল্পনার জন্য করুণা সাহাকে নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯৫৭ সালে কোলকাতায় তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ সালে তিনি ইতালীয়ান সরকারের বৃত্তি লাভ করে ইতালীতে যান। এবং ১৯৫৯ সাল হতে ১৯৬১ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় Accademia Dilelle Art-এ অধ্যাপক Giovanni Colacicchi-র কাছে শিল্প শিক্ষা করেন। শুধু তাই নয় ইতালীতে তিনি স্থানীয় বহু বিশিষ্ট শিল্পীর সঙ্গে একজোটে কাজ করেন। এবং Fresco Painting-র উপর বিশেষ শিক্ষা নেন।

চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে শিল্পীর নিজস্ব মত হল আমরা যে যুগে বাস করছি, যে সমাজে বাস করছি তার প্রতিচ্ছবিই শিল্পীদের শিল্পকলায় ফুটে ওঠা উচিত তবে সব সময় বাস্তবের নিছক অনুকৃতিকরণই প্রকৃত শিল্পের পরিচয় নয় বলেই মনে করি, কারণ শিল্পীরা চোখ দিয়েও যেমন দেখেন, মন দিয়েও অর্থাৎ মানস চোখেও অনেক কিছু দেখে থাকেন।

সুন্দরের সঙ্গে শিল্পীর সম্বন্ধ খুব নিবিড় তবে, সুন্দর কি বিশ্লেষণ করে এ বোঝান যায় না কারণ অনেকের কাছে যা অসুন্দর শিল্পীর চোখে তারই মধ্যে প্রচুর সৌন্দর্য বিদ্যমান। প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য কোন দেশেরই বিশেষ কোন ধারাকে আমি মেনে চলি না তবে পাশ্চাত্যে বহু দেশই চিত্রশিল্পে আজ অনেক অগ্রসর এবং সে সব দেশ হতে আমাদের অনেক কিছুই এখন গ্রহণ করার আছে। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে 'মুড'কেই আমি প্রাধান্য দিয়ে থাকি এবং নির্জন পরিবেশই আমার কাম্য, তবে সংসারে সকলের মধ্যে থেকে তা পাওয়া তো আর সম্ভব নয়।

চিত্রশিল্পে আমাদের দেশের অনগ্রসরতার কারণ সম্বন্ধে শ্রীমতী সাহা বললেন, সরকারী সাহায্যের অপ্রতুলতা তো আছেই তা ছাড়া আছে আমাদের দেশের অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের প্রতি যথোপযুক্ত নজর না দেওয়া। তবে চিত্রশিল্প যে আগের চেয়েও অনেক ব্যাপকতা

লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে যে আমাদের সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে প্রসারতা লাভ করবে সে বিশ্বাস আমার আছে।

করুণা সাহার সঙ্গীতের প্রতিও খুব আগ্রহ এবং তিনি নিজেও একজন সুগায়িকা। ১৯৪৬ সালে তিনি বিশিষ্ট আলোকচিত্রী শম্ভু সাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

শানু লাহিড়ী

মাঝে মাঝে এমন লোক সংসারে জন্মায় যারা কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে নিষ্পিষ্ঠ হয়ে যায় না। তারা তাদের প্রকৃতি বা চেতনায় একদিকে মুক্ত হয়েই জন্মায় এবং অবস্থা ভেদে কবি, ভাস্কর বা চিত্রকর বলে পরিচিত হয়। এখন, সার্থক চিত্রকর কাকে বলব, এ সম্বন্ধে আমাদের অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, "প্রকৃত শিল্পী কেবল অবসর বা ভাব বিনোদনের জন্য শিল্প রচনা করেন না। তাঁহার সৃষ্টি যাহাতে অপরের মনে আসন পায়, তিনি সর্বদাই তাহার জন্য ব্যগ্র। তিনি তাঁহার সৃষ্টি অপরের সম্মুখে ধরিয়া তাহারই মধ্য দিয়া কিছু বলিতে চান যাহা অপরের অনুভূতিতে ধরা পড়িবে।" শিল্পী শানু লাহিড়ী সেই হিসাবে যে সার্থক তা নিঃসন্দেহাতীতভাবে সত্য। তাঁর চিত্রাবলী অত্যন্ত যত্ন সহকারে পরিকল্পিত ও রচিত। কোথাও তার আড়ষ্ঠতা নেই। বরং তাঁর প্রকাশভঙ্গী সরল ও ঋজু তাই তাঁর ছবির আবেদন অত্যন্ত প্রবল। চিত্রবিদ্যার ব্যাকরণ এঁর ভালভাবেই রপ্ত আছে।

ভারতশিল্পের আভিজাত্য বজায় রাখতে সীমার মধ্যে নিজেদের

আবদ্ধ রাখলে কৃষ্টির প্রতিযোগিতায় আমরা অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের কাছে যে হেরে যাব, সে সম্বন্ধে শিল্পী খুবই সচেতন। তাই নানা শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে দেশের শিল্প সম্পদ বৃদ্ধি করার দিকে শিল্পী খুবই আগ্রহশীল। তাই চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে শ্রীমতী লাহিড়ীর নিজস্ব মতামত ও তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় লাভের আশায় একদিন গেলাম তাঁর রাসবিহারী এ্যাভেনিউনের বাড়ীতে। অনেকদিন আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলাম তাঁর স্বামীর কর্মক্ষেত্র আসানসোলে। তিনিও যে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

শানু লাহিড়ী ১৯২৮ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন যদিও তাঁদের আদি নিবাস টাকীতে। পিতা প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার ও মা রেণুকা মজুমদারের। তিনি হচ্ছেন ষষ্ঠ সন্তান। পিতা যদিও পুলিস বিভাগে কাজ করতেন তবু শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর অশেষ অনুরাগ। শুধু তাই নয়, মারও আগাগোড়া বাসনা ছেলেমেয়েদেরকে জীবনে বড় করে তোলার এবং তা বিভিন্ন দিক থেকে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী লাহিড়ী বললেন, "মাকে ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন, মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, দেশ, শনিবারের চিঠি এবং বিভিন্ন ধরণের পুস্তকের মধ্যে ডুবে থাকতে। তাই বলা চলে, এক রকম মা'র ইচ্ছাতেই এই লাইন বেছে নিয়েছিলাম, অবশ্য আমারও ছোটবেলা থেকে এই আঁকার দিকে আগ্রহ ছিল।" প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী নীরোদ মজুমদার এবং চিত্র-সমালোচক কমল মজুমদার তাঁর ভাই। তাঁর এক বোন বাণী মজুমদার এক সময় নৃত্যশিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং বহু দেশও পর্যটন করে বেড়িয়েছেন। ১৯৪৩ সালে তিনি প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ড্রইং ও পেন্টিং-এ মহিলাদের বিভাগে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৫ সালে আশুতোষ কলেজ থেকে আই. এ পাশ করে পর বৎসরই তিনি ভর্তি হলেন আর্ট কলেজে। ১৯৫১ সালে তিনি

ফাইন আর্ট নিয়ে পাশ করলেন। ইতিমধ্যে ১৯৪৯ সালেই চৌরঙ্গী টেরেসের বাড়ীতে তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লীতেও তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এইভাবে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তাঁর ছবির প্রদর্শনী একাদিক্রমে চলতে থাকে। হায়দ্রাবাদ আর্ট গ্যালারি তাঁর অঙ্কিত একটি ছবিও ক্রয় করেছেন। ১৯৫১ সালে ছাত্রাবস্থায় তার অঙ্কিত চিত্রের একটি প্রদর্শনী দেখে Statesman পত্রিকার চিত্র সমালোচক যা মন্তব্য করেছেন তা অনুধাবনযোগ্য: "Sanu Lahiris paintings now be compared with the staffs only instead of the students ১৯৫৬ সালে তিনি প্যারিস, লণ্ডন প্রভৃতি দেশগুলির চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানর্জনের জন্য বিদেশে যান এবং সেঁজান, পিকাসো, ব্রাক, গোঁগা এবং পাওএল ওসেলার ছবি দেখে এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, যে ছবি এতদিন এঁকে এসেছেন তা ছেড়ে দিতে মনস্থ করেন। তাছাড়া ওসব দেশের চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি সম্বন্ধেও অনেকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মারফৎ আপন মনের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে ১৯৫৮ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এখানে বলা হয়তো নিষ্প্রয়োজন হবে না, শ্রীমতী লাহিড়ী শুধু যে চিত্রাঙ্কনেই পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তা নয়, পরন্তু প্রচুর পড়াশুনাও সেখানে করেছেন।

শানু দেবী ১৯৫০ সালে এ্যাকাডেমী হাউস থেকে তাঁর অঙ্কিত একখানি চিত্রের জন্য রৌপ্যপদক দ্বারা সম্মানিত হন। ১৯৫১ সালে প্রেসিডেন্সী ফার্স্ট প্রাইজ পান একশত টাকা। এ ছাড়া আর্ট কলেজের Vacation Prizeগুলি এক রকম তাঁর বাঁধা ছিল বলা যেতে পারে। শিল্পী হিসেবে শ্রীমতী লাহিড়ী তেলরঙটাকেই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। সবুজ, ফিকে লাল, ওকার এবং কমলালেবু রঙটাকেই পচ্ছন্দ করেন বেশী।

ছবির বিষয় বস্তু আপনার কি—এ প্রশ্ন করতে তিনি বললেন "ইম্প্রেশানিষ্টিক ছবি অর্থাৎ বাইরের দৃষ্টি গ্রাহ্য রূপকেই তুলির

টানে ধরে রাখাটাই আমি পছন্দ করি। এ্যাবসট্রাক্ট বা কিউবিজম, শিল্পীকে আমি পচ্ছন্দ করিনা।"

আর্টের সঙ্গে সুন্দরের কোন সম্পর্ক আছে কি? এবং শিল্পী কি সুন্দরের উপাসক?" এই প্রশ্ন করতে।

"দেখুন" শ্রীমতী লাহিড়ী বললেন, "সুন্দর বলতে আপনি কী বলতে চান, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ধরণ সুন্দরকে এক একজন এক এক দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করেছেন, কারণ ক্রোচে সুন্দরকে সহজ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হিসেবে দেখেছেন। ফ্রয়েড বা হার্ভার দেখেছেন অন্যরূপে। আমার মনে হয়, সুন্দর একটা রিলেটিভ টার্ম। অর্থাৎ একজনের কাছে যা সুন্দর, অপরের কাছে তা সুন্দর নাও ঠেকতে পারে। তবে শিল্পীযখন কিছু করেন তখন তা সুন্দরভাবেই রূপায়িত করতে চেষ্টা করেন।"

আর একটা কথা "আমরা যে যুগে বা যে সমাজে বাস করছি তারই প্রতিচ্ছবি কি শিল্পীদের শিল্পকলায় সব সময় ফুটে ওঠবে।

এমন কোনো কথা নেই; কারন শিল্পীদের জগৎ, শুধু যা দেখছি সে সমাজকে নিয়েই নয়, তার বাইরে যে বৃহত্তর জগৎ আছে তার আবেদনও যে শিল্পীদের মনের দুয়ারে এসে আঘাত করে সেটাও ঠিক। আমার মনে হয়, শিল্পীরা নতুন কিছু করবে। দৃষ্টিগ্রাহ্য সকল জিনিষকেই যে রূপ দিতে হবে; এমন নির্দিষ্ট কিছু নেই।"

আমার অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "মুড' না থাকলে ছবি আঁকা সম্ভব নয়। তবে কোন জিনিষকে রূপ দেওয়ার আগে তার সম্বন্ধে বেশ খানিকটা চিন্তা করতে হয়।"

আমার সর্বশেষ প্রশ্ন, "সঙ্গীত, নৃত্য বা উপন্যাসের মত চিত্রশিল্প আজও সে রকম ঘরে ঘরে সমাদৃত হয় না, যদিও এই শিল্পকে আর্টের এক প্রধান অঙ্গ হিসাবে ধরা হয়ে থাকে, এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?'

"দেখুন" শানু দেবী বললেন, "অন্যান্য দেশে এই শিল্পকে

যেভাবে গ্রহণ করা হয়, আমাদের দেশে তা কল্পনাও করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ তিনি প্যারিসের একটা ছড়ার কথা বললেন। ছড়াটা হচ্ছে—

Painteur a luil
C'est bein
Difficil mais
Becaucoup plus
Joli quela
Painteur alcu

যার মানে হচ্ছে, 'তেলরঙে ছবি আঁকা শক্ত, কিন্তু হয় খুবই সুন্দর জলরঙের চেয়ে।' ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে প্রায় এ ধরণের ছড়া শুনতে পাওয়া যায়, কারণ ও দেশের শিক্ষাধারাই অন্যরূপ, যেটা আমাদের দেশে হয় না। তবে পূর্বের চেয়ে এখন যে কিছুটা উন্নত হয়েছে সে কথাটা ঠিক।

শ্রীমতী লাহিড়ী ১৯৫০ সালে প্রভাত লাহিড়ীর সঙ্গে পরিনয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যার জননী। শিল্পী হিসেবে নিজেকে আরো পরিব্যাপ্ত করার বাসনা এখনও তাঁর মনের মধ্যে প্রবলভাবে জাগ্রত।

আমিনা কর

আর্ট সম্পর্কে রোঁদ্যার মত হল, 'আর্ট হচ্ছে ধ্যান'। অবনীন্দ্রনাথ বলেন, বস্তুর মাঝে যে ভাব নিহিত আছে তাহা যিনি শিল্পসৃষ্টি দিয়া ধরিতে পারেন এবং সেই ভাবগুলিকে আপনার ভাবে মিলাইয়া আন্তরিক অনুভূতি দিয়া প্রকাশ করেন প্রকৃত শিল্পী আখ্যা লাভ করেন

নিজের অঙ্কিত একটি চিত্রের সামনে বসে আছেন আমিনা কর

তিনিই। আমিনা কর সেই জাতের শিল্পী। তাঁর খ্যাতি তাই শুধু বাঙ্গলা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সারা ভারতে চিত্রশিল্পীদের মধ্যে তাঁর স্থানটি বিশেষভাবে চিহ্নিত। নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই শিল্পকে কি করে সুন্দর করে তোলা যায় তারি চিন্তায় তিমি নিমগ্ন। তাই চিত্রাঙ্কনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আমিনা করের নিজস্ব মতামত ও তাঁর ব্যক্তিগত পরিচিতি সংগ্রহের আশায় একদিন গিয়ে হাজির হলাম তাঁর বাসায়।

শ্রীমতী কর ১৯৩০ সালে কলকাতায় জণ্মগ্রহন করেন। পিতা

প্রখ্যাত চিকিৎসক ও পশ্চিম-বাঙলার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডাঃ আর আমেদ ও মা আয়েসার তিন কন্যা ও এক পুত্রের মধ্যে তিনি তৃতীয়। ছাত্রী হিসাবে তিনি আগাগোড়াই মেধাবী ছিলেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তারপর দিল্লীতে আরউইন কলেজে তিনি প্রবেশ করলেন। সেখানে এক দিকে যেমন ছাত্রী হিসাবে পাঠগ্রহণ করতে লাগলেন, অন্যদিকে শিক্ষকতাও করতে শুরু করলেন। তিন বৎসর সেখানে থাকার পর ১৯৪৯ সালে তিনি ফ্রান্সে যান শিল্প সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। এখানে বলা প্রয়োজন শ্রীমতী করের মধ্যে অতি শৈশবকাল হতেই চিত্রশিল্পের প্রতি আগ্রহ দেখা দেয় এবং তিনি বাড়ীতে বসে একা একা আপন মনেই ছবি আঁকতে থাকেন। এবং দিল্লীতে থাকাকালীন তাই বোধ হয় তিনি মাঝে মাঝে ছুটে যেতেন আশপাশের ষ্টুডিওতে। তখন তার বয়স কত? চৌদ্দর কোঠায় সবে পা দিয়েছেন। কখনও বা যেতেন প্রখ্যাত ভাস্কর চিন্তামণি করের স্টুডিওতে। স্টুডিওতে গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতেন আর ঔৎসুক্যেভরা এক জোড়া চোখ মেলে শিল্প জগতের টুকিটাকি জানতে চাইতেন শিল্পীর কাছ থেকে। যতই শুনতেন ততই মুগ্ধ হয়ে যেতেন শিল্পীর অসামান্য কর্মদক্ষতায়। কে জানত সেদিনের ওই কিশোরী মেয়েটিই পরবর্তী জীবনে সেই তরুণ ও উদীয়মান শিল্পীর জীবনসঙ্গিনী হয়ে দেখা দেবেন। শ্রীমতী আমিনা নিজেও যেমন জানতেন না সে কথা, তেমনি জানতেন না সেই শিল্পীও।

যাই হোক ফ্রান্সে গিয়ে তথাকার প্রখ্যাত চিত্রকরদের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হল তাঁর এবং তিনি Abstract Paintaings'র অগ্রবর্ত্তী চিত্রকর সেজার, দোমেলা প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন। Kandinsky'র শিল্পধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আর যে কয়জন শিল্পী দ্যাষ্টিল শিল্পান্দোলনের মুখ্যনায়ক তাঁদের নিজস্ব ধারণাকে গোষ্ঠীবদ্ধ-ভাবে প্রকাশ করে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে হলাণ্ডের মন্দ্রিয়ান ও দোমেলা জগতে বিখ্যাত। দোমেলা অবশ্য পরে দ্যাষ্টিল

শিল্পসাধনায় পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা নেই মনে করে অন্য ধরণের শিল্পরচনা আরম্ভ করেন। দোমেলার রচনায় দেখা যায় একাধারে চিত্র ও ভাস্কর্যের এক অদ্ভুত মিলন। বর্ণময় পটভূমিতে দোমেলা কাঠের বা ধাতব অবয়বের সংযোগ করে স্বপ্নাবেশ নানা ছন্দময় রূপকের সৃষ্টি করে থাকেন। আমিনা কর দোমেলার এই অভিনব রচনাদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। যাই হোক, অঙ্কন প্রণালী ছাড়াও সে দেশের শিল্পপদ্ধতি ও জনজীবনের উপর এই শিল্পের প্রভাব কতখানি তাও তিনি স্বচক্ষে দেখলেন। এই তিন বৎসর তিনি এ্যাকাডেমি জুলিয়াঁতে ব্রসোমিয়ার অধীনে কাজ করেছেন।

১৯৫৩ সালে তিনি ভারতে ফিরে এলেন এবং পরবৎসরই দিল্লীতে তাঁর একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল। শুধু ঐ একটি বৎসরই নয় একাধিক্রমে চার বৎসর অনুষ্ঠিত হল তাঁর চিত্রের একক প্রদর্শনী। এই সময় তাঁর প্রদর্শিত চিত্রগুলি জনচিত্ররসিকদের মনে প্রচুর সাড়া জাগায়। দিল্লীতে থাকাকালীন তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হল দিল্লীর ইণ্টারন্যাশন্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীস ফেয়ারের প্রাচীর চিত্র ও অলঙ্করণের কাজ সমাধা করা।

১৯৫৭ সালে তিনি পুনরায় প্যারিসে গেলেন। একোল দ্য লভ্যুর থেকে চার বৎসর অধ্যয়নের পর মুজিয়োলজির ডিপ্লোমা লাভ করেন। সারা বিশ্বের প্রায় সকল কিউরেটর একোল দ্য লভ্যুর থেকে কিছু না কিছু শিক্ষা নিয়ে বেরিয়েছেন। বাঙালী একটি মেয়ের এই ডিপ্লোমা অর্জন করা যে খুবই গর্বের তা নিঃসন্দেহ। ঐ সময় তিনি পাশ্চাত্যের আরো কতকগুলি দেশ ভ্রমণ করলেন চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার জন্য। ১৯৬১ সালে তিনি দেশে ফিরে শিল্পের সাধনায় গভীরভাবে নিয়োজিত করলেন নিজেকে।

ভারত সরকারের আনুকূল্যে নিউইয়র্ক বিশ্বমেলায় শ্রীমতী করের দশ ফুট বায় চৌত্রিশ ফুট একখানি প্রাচীর চিত্র প্রেরিত হয়েছিল।

শ্রীমতী কর তেলরঙে ছবি করতে ভালবাসেন। এচিংও তিনি করে থাকেন। শিল্পী বাস্তব থেকে ক্রমপর্যায়ে বিমূর্ত ধারায় এসেছেন। ভিন্ন ভিন্ন রঙের বিন্যাসেই একটা বিমূর্ত ভাবকে অভিব্যক্ত করে তোলায় তিনি প্রয়াসী। ফিগারেটিভ কাজও তিনি করে থাকেন। কোন বিশেষ রঙকেই তিনি প্রাধান্য দিতে ভালবাসেন না। এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যে, পিকাসো যেমন সাময়িকভাবে তাঁর রচনায় কেবল গোলাকার আভাময় কিংবা কখনও নীল আভাময় ছবির বৈশিষ্ট দেখিয়েছেন, সে ধরণের নজীর আর কোন প্রখ্যাত শিল্পীর রচনায় দেখা যায় না।

শ্রীমতী কর বললেন আমরা যে স্থলে বা যে সমাজে বাস করছি, তারই প্রতিচ্ছবি শিল্পীদের শিল্পকলায় ?

সব সময়ই ফুটে উঠবে এমন কোন কথা নেই। কারণ শিল্পী কবি বা সাহিত্যিক যিনিই হউন না কেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির। সাধারণ ব্যক্তি সমাজের উপরটাই দেখে থাকেন। কিন্তু শিল্পীর চোখ বাহ্যিক আচ্ছন্ন না থেকে তাঁর হৃদয়াবেগ প্রকৃতির সুপ্ত সত্যকে অন্তরনিষ্ঠা দিয়ে অনুধাবন করে।

আমার পরের প্রশ্ন, আজকাল শিল্পজগতে দুই ভিন্ন মতাবলম্বী দলের সন্ধান পাওয়া যায়। এক দল ইউরোপীয় শিল্পধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন কিছু করতে চান, অন্য দল ভারতের অতীত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন। ঐ বিষয়ে আপনার মত কি ?

—দেখুন, শ্রীমতী কর বললেন, অতীতের শিল্প ঐতিহ্য আমাদের মনেপ্রাণে যখন প্রবহমান, তখন তাকে আলাদা করে দর্শনের চেষ্টা বা চর্বিতচর্বণ করতে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তাকে সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে যাওয়াই শিল্পীর পক্ষে সঙ্গত।

আমার আর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, সাধারণ অর্থে

যাকে সুন্দর বলা হয়, শিল্প তাকে বাদ দিয়েও হতে পারে। সুন্দর একটা রিলেটিভ টার্ম। অর্থাৎ একজনের চোখে যা সুন্দর অপরের চোখে তা সুন্দর নাও ঠেকতে পারে।

শিল্পীরা নির্জনতা পছন্দ করেন কিনা অথবা আবেগের বশবর্তী হয়ে আঁকেন কিনা জানতে চাইলে শিল্পী আমিনা বললেন, আপনার উভয় কথাই সত্য। একাকীত্ব শিল্পীদের প্রয়োজন বলেই মনে করি এবং ভাব বা আবেগ না এলে ছবি আঁকা কিছুতেই সম্ভব হয়ে ওঠে না।

উমা দাস

কোন এক বিখ্যাত শিল্পীর কথাঃ Everything is worth knowing, learn the art and lay it aside। কিন্তু আমাদের দেশে বহু শিল্পী বর্তমানে বিদেশে যান এবং বিদেশ থেকে ফিরে আসেন সেখানকার দৃষ্টিভঙ্গী ও করণকৌশল আয়ত্ব করে! ভারতবর্ষে এসে

তাঁরা যে সব রচনা করেন তাতেও বেশীর ভাগ সময় প্রকাশ পায় বিদেশী দৃষ্টিভঙ্গী। স্বদেশের মাটির সঙ্গে শিল্পীরও যে একটা আত্মিক যোগ আছে বহু ক্ষেত্রেই তাঁদের মধ্যে অনেককে বিস্মৃত হতে দেখা যায়। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শিল্পীকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না। কারণ তাঁহাকে সমস্ত সমাজ মনের কেন্দ্র হইয়া সামাজিক ভাবগুলি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। প্রকাশ কার্য্য সফল করিবার জন্য শিল্পীকে দেশ বা সমাজের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হইবে। কারণ প্রকাশ তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন শিল্পীর চৈতন্যে সমাজ মনের ভাবগুলি যাতায়াত করে।" উমা দাস পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তাঁর চিত্রকলায় পাশ্চাত্যের প্রভাব পড়েনি। ইনি বিদেশী প্রথা প্রকরণ ব্যবহার করলেও এঁর রচনাকে কোনও বিদেশীর রচনা বলে ভ্রম হয় না। এটাই এঁর সবচেয়ে বড় গুণ। বিদেশ

থেকে প্রথা প্রকরণ আদায় করে তা কাজে লাগিয়েছেন নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধি প্রকাশ করতে। বিদেশীয় মেজাজকে ইনি গ্রহণ করেন নি। শিল্পীর সঙ্গে কথাবার্তায় জানতে পারলাম অতীতের চিন্তাধারার সঙ্গে বর্তমানের চিন্তাধারার তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। উভয় সময়কার ছবিও তিনি প্রদর্শন করলেন।

দেখলাম দীর্ঘ সময়ের পরীক্ষণ নিরীক্ষনের পর তিনি যে আর্টের সৃষ্টি করেছেন তার সত্যিই বৈশিষ্ট আছে। যদিও কিউবিজমের কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় তা হলেও রচনাগুলি অভিনব। কিউবিষ্টদের মত রেখা ও গঠনের সংস্কারককে ইনি একেবারে কোথাও নির্মূল করেন নি। কোনও অসঙ্গত ঋজুটানে ছন্দকেও বিসর্জন দেন নি। বরং ছন্দটাই এঁর রচনায় অতি স্পষ্ট। ভাব প্রধান ছবি ছাড়াও প্রতিকৃতি এবং আলঙ্কারিক রচনাগুলির মধ্যে থেকেও শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। টেনে ফেনিয়ে অতিরিক্ত ব্যাপক করে তোলেননি তিনি তাঁর কোন রচনাকে। তৈল মাধ্যমের করণকৌশল এঁর খুবই দখলে। তাঁর রচনাগুলি তাই খুব উপভোগ্য। শরীরস্থান, পরিপ্রেক্ষিত, আলোক বিজ্ঞান এ সব চিত্রবিদ্যার ব্যাকরণেও শিল্পী বেশ পাকা। শিল্পীর রঙের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বর্ণ সঙ্গতি সংযত ও সুরুচির পরিচায়ক। নানান ধারায় ছবি রচনা করে থাকলেও তাঁর প্রায় প্রত্যেক ছবিতে নকসার ছন্দোময় সঙ্গতির বাহার মনকে পুলকিত করে।

চিত্রাঙ্কন ছাড়াও টেক্সটাইল ডিজাইনেও শিল্পীর বিশেষ অনুরাগ। ইনি লণ্ডনের সেন্ট্রাল স্কুল অফ আর্ট এ্যাণ্ড ক্রাফট থেকে কাপড়ের উপর নক্সা ছাপার নানান প্রথা প্রকরণ শিক্ষা করেছেন। টেক্সটাইল ডিজাইন বিভাগের বেশীর ভাগ নক্সা তিনি ছাপেন স্ক্রীণপ্রিন্টিং পদ্ধতিতে। কাপড়ের উপর ব্লক পদ্ধতিতে ছাপার কাজ ভারতবর্ষে যা বহুদিন ধরে চলে আসছে, রেখা এবং ঢালা বর্ণের প্রয়োগ ছাড়া ব্লক-প্রিন্টিংএ আর কিছু সম্ভব নয়। কিন্তু স্ক্রীণ পদ্ধতিতে লাইন, টোন,

টেকসচার সবই ছাপা সম্ভব। এমন কি কলমে টানা সূক্ষ্ম রেখা অথবা ড্রাইব্রাশের কাজও স্ক্রীণপ্রিন্টিংএ সম্ভব হয়। এই কাজ তিনি ভাল করেই শিক্ষা করে এসেছেন। আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় দেখে অত জটিল নক্সা কি করে ছাপা সম্ভব কাপড়ের উপর। শ্রীমতী দাস বৃটিশ মিউজিয়াম এবং ভিক্টোরিয়া এ্যালবার্ট মিউজিয়াম থেকে এমন সব প্রাচীন ভারতীয় টেক্সটাইল ডিজাইন নকল করে এনেছেন যা আমাদের দেশের পরবর্তী শিল্পীদের প্রচুর কাজে লাগবে।

শ্রীমতী দাস ১৯১৮ সালে রঙপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ও মাতা ডাঃ নগেন্দ্রমোহন গুপ্ত ও জ্যোতির্ম্ময়ী গুপ্তের দুই কন্যার মধ্যে তিনি কনিষ্ঠা। ১৯৩৪ সালে রঙপুর স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ঐ বছরেই তাঁর বিবাহ হয় ডঃ নবগোপাল দাস আই সি এস এর সঙ্গে। ১৯৩৯ সালে কলকাতায় সরকারী চারু ও কলা মহাবিদ্যালয়ে তিনি প্রবেশ করেন। তখন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মুকুল দে। এখানে উল্লেখযোগ্য শ্রীমতী দাসই আর্ট কলেজের প্রথম বার্ষিকীর ছাত্রী।

উমা দেবীর ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার দীর্ঘ বারো বৎসর পরে তিনি ১৯৪৬ সালে ইণ্টারমিডিয়েট ও ১৯৪৮ সালে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৪ সালে তিনি বিলাতে যান এবং সেখানে সেণ্ট্রাল স্কুল অফ আর্ট এ্যাণ্ড ক্র্যাফট্‌স্‌এ ভর্ত্তি হন এবং শিক্ষা সমাপান্তে ১৯৫৬ সালে দেশে ফেরেন। ফিরে আসার পর বোম্বাইয়ে বহুদিন যাবৎ খাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মাঝে উদয়ভিলাতে কাজ করেছেন কয়েক মাস। ১৯৫৮ সালে তাঁর চিত্রের প্রদর্শনী হয় আর্টিষ্ট্রী হাউসে। ১৯৬০ সালে বোম্বাইয়ের জাহাঙ্গীর গ্যালারীতে তিনি তাঁর অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, তেলের কাজ, জলের কাজ, লাইনোকাট, লিথোগ্রাফ এবং পেন্সিলের কাজ তিনি করে

থাকেন। তবে সবচেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন তৈল মাধ্যমেই। নারীর দেহভঙ্গিমাকেই তিনি ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

আমরা যে যুগে বা যে সমাজে বাস করছি তারই প্রতিচ্ছবি কি শিল্পীদের শিল্পকলায় ফুটে ওঠা উচিত নয়?

আমার এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী দাস বললেন, হ্যাঁ উচিত। তবে কারুর তা প্রকাশ প্রায় প্রত্যক্ষভাবে এবং কারুর অপ্রত্যক্ষভাবে। আমার কথাই ধরুন, সমাজের ভাল বা মন্দ সব কিছুরই ছবি ফুটে ওঠে নারীর মুখের মধ্যে এবং সেই মুখাবয়বকেই আমি চিত্রে রূপ দিয়ে থাকি।

আমার পরের প্রশ্ন, আজকাল চিত্রশিল্পে দুই ভিন্নমতাবলম্বী দলের সন্ধান পাওয়া যায়। একদল চান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে নতুন কিছু করতে এবং অপর দল চান ভারত শিল্পের পুনরুদ্ধার করতে। আপনি কোন্ মতাবলম্বী।

দেখুন, শ্রীমতী দাস বললেন, আমি কোন মতাবলম্বীই নই। সম্পূর্ণ প্রাচ্য মতেও ছবি রচনা করে থাকি, আবার পাশ্চাত্যের ভাল জিনিস গ্রহণ করার মধ্যেও আমার কোন দ্বিধা নেই।

আমার অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন শিল্পীরা সুন্দরের উপাসক বলেই মনে করি। এবং ছবি আঁকতে গেলে নির্জনতাও তাঁদের কাম্য।

চিত্রাঙ্কণ এবং ডিজাইন করা ছাড়াও শ্রীমতী দাস সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। সঙ্গীত সম্মিলনী থেকে তিনি সুরশ্রী উপাধিপ্রাপ্তা। সেতার বাজনাতেও তিনি পারদর্শিনী। উমা দাসের আর এক বোন সতী ঘোষ লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা।

আমার সব শেষ এক প্রশ্নের উত্তরে উমা দেবী বললেন, যদিও আমার স্বামী ডঃ দাসের চিত্রাঙ্কণের বিষয় সম্পূর্ণ অজানা তবুও

আমাকে কোন দিনই তিনি নিরুৎসাহ করেননি বা আমার কাজে বাধা দেননি।

শ্রীমতী দাস উপযুক্ত দুই পুত্র, পুত্রবধূ ও স্বামীকে নিয়ে যেমন এক সুখী পরিবার গড়ে তুলেছেন তেমনি অন্য দিকে এই শিল্পের উন্নতির জন্য নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন।

হৈমন্তী সেন

শিল্পসৃষ্টি না করে মানুষ থাকতে পারেনি, থাকতে পারেও না। শিল্পের মধ্য দিয়েই যুগ যুগান্তরের ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে এসে ধরা দেয়। শিল্পের মধ্য দিয়েই মানুষ আপন চলার পথ খুঁজে

পায়। শিল্পই জাতির মেরুদণ্ড। তাই শিল্পী হবার বাসনা জাগে অনেকের হৃদয়ে। স্বপ্ন দেখে অনেকেই। কিন্তু হয় কজন! মহাকবি গ্যেটেও একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর ধারনা ছিল, ইচ্ছে করলে তিনিও একজন বড় শিল্পী হতে পারেন। তিনি বলতেন, One

should be able to make oneself master of any subject ইচ্ছা করলে যে কেউ যা খুশী হতে পারে। মহাকবি গ্যেটেও নামজাদা চিত্রকর হতে চাইলেন। গ্যেটে তুলি ধরলেন। ভাল ভাল সব শিল্প শিক্ষকও নিযুক্ত হল তার জন্য। অন্যরা সময়কে যখন সিগারেটের ধোঁয়া করে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়, তিনি তখন ছবি আঁকেন। কিন্তু তবুও হল না। হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন, Despite of all my efforts I did not become an artist.

তাই প্রকৃত শিল্পী হতে গেলে এমন লোক চাই, যার হৃদয় আছে,

শিল্পী অঙ্কিত একখানি চিত্র।

আবেগ আছে, আবার তাকেই তরল করতে পারেন সহজাত প্রতিভা দিয়ে। যিনি নিজের চোখ দিয়ে অপরকে দেখিয়ে দিতে পারেন। সে চোখ অন্তর নিরপেক্ষ নয়।

হৈমন্তী সেন হচ্ছেন ঐ জাতের শিল্পী। তাঁর রচনার মধ্যে পাশ্চাত্যের প্রভাব থাকলেও কোন বিশেষ ধারায় তিনি চলেননি বা অনুকরণও করেননি। বর্নিকা, রচনাভঙ্গী বা গঠন প্রকৃতিতে যেমন শিল্পীর স্বকীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে ছবির বিশেষ বিশেষ ভাব বা মেজাজ ফুটিয়ে তোলার জন্য পাশ্চাত্য রীতিনীতিও মেনে চলেছেন। তাতে করে ছবির রস বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং তা আরও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। সত্যিকার শিল্পী তো হলেন তারাই, যাঁরা প্রথা-প্রকরণ ধার করলেও তা আপন ব্যক্তিত্বের রসে পরিপূর্ণ করে বিশিষ্ট রূপ দেওয়াতে পারেন। অবনীন্দ্রনাথ তাইতো বলেছেন, 'নানা শিল্পে নানা প্রথা-প্রকরণ শিল্পীকে দেশ-বিদেশ থেকে আদায় করতে হয় চটপট, শুধু সেই প্রকরণ প্রয়োগের সময় বিচার ও ভেবে চিন্তে ক্রিয়া করার কথা উঠে।' যদিও বর্তমানে বহু শিল্পী বিদেশে যান এবং সেখান থেকে ঘরে ফিরে আসেন সেখানকার দৃষ্টিভঙ্গী ও ক্রিয়াকৌশল আয়ত্ত করে। যার ফলে এঁদের ছবির আত্মা স্বদেশের মাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু হৈমন্তী সেই Learn it, and lay it aside কথাটি পুরোপুরি মেনে চলেন।

তিনি বহু জায়গায় ঘুরেছেন। অগোচরের, অবাস্তবের, অসম্ভবের অজানার সঙ্গে দৃষ্টি বদল করার যে দুর্নিবার ইচ্ছা শৈশবে তাঁর মনে উঁকি দিয়েছিল, তাকেই সাধনপথের সাথী করে পৃথিবীর প্রায় অর্ধগোলার্ধ ভ্রমণ করেছেন হৈমন্তী সেন। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধিৎসা শুধু দৃষ্ট রূপের বাইরেতেই ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসেনি, তাদের অন্তরের গোপন রহস্য ভেদ করে চলে গেছে। কিন্তু তিনি পুরোপুরি তদ্বৎ করেননি। অবচেতন মনের মধ্যে যে প্রভাব থেকে গেছে, তাই থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে প্রকৃত রসরচনা।

ইনি পুরোপুরি আধুনিকপন্থী নন এবং তাই তাঁর ছবিতে বিশেষ কোন তন্ত্রের অবতারণা যেমন নেই, ক্যামেরায় তোলা ছবির মত

কল্পনাশূন্য মানসিক অবস্থা নিয়েও চিত্র রচনা তিনি করেননি। ছবির ব্যাকরণ সম্পূর্ণ মেনে চলে বাস্তবকে চোখের সামনে ধরে রসোত্তীর্ণ শিল্প উদ্ভাবনার দিকে তিনি লক্ষ্য রেখে চলেন। যার জন্য তাঁর ছবি দেখতে গিয়ে ক্যাটালগ হাতে ঘুরতে হয় না। দর্শকরা আপনা আপনিই ছবির অন্তর্নিহিত রূপটি ধরতে পারেন এবং মনে মনে পুলকিত হন।

যদিও গোড়ার দিকে কিউবিজমের কিছু আঁচ পাওয়া যায় তাঁর ছবিতে, তবু কিউবিষ্টদের মত রেখা ও গঠনের সংস্কারকে একেবারে নির্মূল ইনি কোথাও করেননি। কোনও অসঙ্গত টানে ছন্দকেও বিসর্জন দেননি। তাই তাঁর ছবিগুলি অভিনব। সাদৃশ্য সত্য ধরে অঙ্কিত স্কেচগুলিতেও তাঁর দরদী হাতের ছাপ পাওয়া যায়। তাঁর ফিগারেটিভ কাজগুলিও লক্ষ্য করার মত। এই প্রসঙ্গে শিল্পী আমাকে বললেন, দেখুন, আমার কাছে ছবির ষ্টাইলটাই বড় কথা নয়, স্পিরিট-টাই বড় এবং তা যদি ছবির মধ্যে অনুপস্থিত থাকে তাহলে ছবির সার্থকতা নষ্ট হয় বলে মনে করি। শিল্পীর রঙের নির্বাচন, ও বিষয় বস্তুর পরিকল্পনা যেমন অভিনব, তুলির টান ও রচনাকৌশলও সাবলীল যার জন্য তাঁর অধিকাংশ চিত্রই প্রাণবন্ত ও মনোমুগ্ধকর।

শিল্পী শ্রীমতী সেন সাধারণতঃ তেল রঙেই ছবি এঁকে থাকেন এবং এই মাধ্যমটিতে তাঁর দখল অসাধারণ। এরি মাধ্যমে ক্লাসিকাল ষ্টাইলে এমন অনেক রচনা আছে যা দেখে পাশ্চাত্যের কয়েকজন ধুরন্ধর শিল্পীর সঙ্গে তুলনা করার আমার সাহস না হলেও মহিলা চিত্রশিল্পী হিসাবে আমাদের দেশে যে তিনি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহ।

হৈমন্তী সেন ১৯৩০ সালে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক অমিয়কুমার সেন ও মাধুরী সেনের তিনি একমাত্র কন্যা। ভূতপূর্ব্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশোককুমার সেন শিল্পীর খুল্লতাত। ১৯৩৫ সালে তাঁরা সকলেই কলকাতায় চলে আসেন। কাকা

অজিত সেনের কাছে তিনি ছবি আঁকার প্রথম প্রেরণা লাভ করেন। ছবিআঁকার মত নৃত্য ও গীত ছোটবেলা থেকেই তিনি ভালবাসতেন। সুরেলা গলাও ছিল। সভা সমিতিতে অংশও নিয়েছেন বহুবার এবং সুনামও অর্জন করেছেন।

১৯৪৯ সালে আশুতোষ কলেজ থেকে বি, এ পাশ করার পর তিনি আর্ট কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৯৫২ সালে পাশ করে বেরিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন ফাইন আর্টের ছাত্রী। শিল্প শিক্ষক ও পরামর্শদাতারূপে তিনি অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, অতুল-বাবু, আদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন চক্রবর্তী, বসন্ত গাঙ্গুলী প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন। বিশেষ করে শিল্পশিক্ষায় অনিলবাবুর অবদান ভোলার নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হাতে নাতে গড়ে তুলেছিলেন সেদিনের সেই কিশোরীটিকে। মুক্তকণ্ঠেই একথা স্বীকার করলেন শ্রীমতী সেন।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে ইনি চারবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। কখনও গেছেন ইটালী, কখনও জার্মাণী, অষ্ট্রেলিয়া। ফিরে আসার কিছু পর আবার গেছেন চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রাশিয়া, চীন, শেষে গেছেন বুদাপেষ্ট প্রভৃতি জায়গায়। বহু প্রখ্যাত শিল্পীর সংস্পর্শে এসেছেন সেখানে এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করে দেশে ফিরেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, ওদেশে আমাদের চেয়েও নতুন বা আলাদা কিছু শেখান হয় বলে আমি মনে করি না, তবে ওদেশে সুযোগ প্রচুর এবং পরিবেশও মনোরম।

আমাদের এখানে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী হয় ১৯৫৪ সালে কল-কাতার আর্টিষ্ট্রি হাউসে। তাঁর সে প্রদর্শনী এমনই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল যে, প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিকা তাঁর উচ্চ প্রশংসা না করে পারেনি। কোন এক সমালোচক লিখেছিলেন, At the present moment we have no outstanding woman painter other than

Haimanti। শিল্প শিক্ষিকা হিসেবও তিনি বহুদিন যাবৎ কমলা গার্লস স্কুলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

হৈমন্তী সেন বর্তমানে তাঁর লেক গার্ডেন্সের বাড়ীতে একদিকে স্বামী সুখেন্দু মজুমদার ও একমাত্র কন্যাকে নিয়ে সাংসারিক কাজে নিজেকে যেমন ব্যাপৃত রেখেছেন, অন্য দিকে ছবির ব্যাপারে নতুন কিছু সৃষ্টির প্রয়াসেও তিনি বদ্ধপরিকর।

নীপা চৌধুরী

রঙ ও রেখার ব্যবহারের কৌশলে পটভূমি ও বিষয়বস্তুকে সাজিয়ে সুসঙ্গত করবার দক্ষতা যে সব শিল্পী অর্জন করেছেন নীপা চৌধুরী তাদের মধ্যে অন্যতম।

নীপা চৌধুরি ১৯৩৪ সালে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নির্মলচন্দ্র মৈত্র ওমাতা রাধারাণী দেবীর সন্তানদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন তৃতীয়। সরকারী কাজে ব্যাপৃত থাকার ফলে পিতার সঙ্গে তাঁকেও ঘুরতে হয় এখানে ওখানে। শৈশব হতেই নীপার চিত্রাঙ্কনের প্রতি ঝোঁক দেখা দেওয়ায় তাঁর পিতা ১৯৫০ সালে কলকাতায় স্থায়ীভাবে চলে আসেন এবং তার পরেই কন্যাকে Govt. Art College-এ ভর্ত্তি করিয়ে দেন। ১৯৫৭ সালে কলেজ ত্যাগের পর শ্রীমতী চৌধুরী আর্টিষ্ট্রী হাউসে একটি একক প্রদর্শনী খোলেন। তারপর দিলীপ দাসগুপ্তের ট্রেণিংএ তার ষ্টুডিওতে চলে অত্যাধুনিক চিত্রকলার পরীক্ষা নিরীক্ষা। ১৯৫৮ সালে নতুন দিল্লীতে All India Fine Arts হাউসে পুনরায় তাঁর একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ সালে অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। এবং পরবর্তী বছরেই তিনি ফিলিপাইন, মালয় প্রভৃতি দেশগুলি ভ্রমণ করে পাশ্চাত্য শিল্পের দক্ষতা অর্জন করেন।

দেশে ফিরে আসেন ১৯৬১ সালে। ফিরেই আর্টিষ্ট্রী হাউসে এই শিল্পীর পঁয়ত্রিশখানি তৈলচিত্রের একটা একক প্রদর্শনী করেন। বিদেশ সফরান্তে শিল্পীর এই প্রথম প্রদর্শনী। দুর্ব্বোধ্য জটিল নক্সা বানিয়ে উচ্চাঙ্গের চিত্র সৃষ্টি করবার ভান তাঁর মধ্যে কোথাও নেই। বিদেশে গিয়ে যা তিনি দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন, সহজ সরলভাবে

তাই তিনি পরিস্ফুট করেছেন, তাঁর চিত্রের মাধ্যমে। প্রতিটি রচনাই শিল্পীর নিপুণভাবে কাজ করার ক্ষমতারই পরিচয় দেয়। পুনরায় তিনি প্যারিস, নিউইয়র্ক এবং লণ্ডনে যান এবং সে সব দেশের প্রতিটি শহরেই তিনি তাঁর ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। শিল্প সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নানান অভিজ্ঞতায় তাঁর অন্তরের ঝুলি বোঝাই করে শ্রীমতী চৌধুরী দেশে ফিরে আসেন।

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, যে যুগে আমরা বাস করছি, যে সমাজে বাস করছি তারই প্রতিচ্ছবি শিল্পীদের শিল্পকলায় সব সময় ফুটে উঠবে এমন কোন কথা নেই, বরং যে স্তরে আমরা বাস করছি অর্থাৎ যাদেরকে জানি, চিনি বা যাদের মনকে উপলব্ধি করেছি তাদের ছবিই শিল্পীদের শিল্পকলায় ফুটে ওঠা উচিত বলে আমি মনে করি, কারণ, আমাদের স্তরের বাইরে যারা আছে, যেমন ধরুন উদ্বাস্তুদের জীবন কাহিনী—করুণ হতে পারে জ্বালা যন্ত্রনায় দ্বিধাবিভক্ত হতে পারে, কিন্তু তাই নিয়ে তুলি ধরলে তা অনেক কষ্টকল্পিত হবে না কি ? শিল্পীদের এই কারণেই সুন্দরের উপাসক না বলে চরিত্রের উপাসক বলেই মনে করি। আর একটা কথা, বাস্তবের নিছক অনুকৃতিকরণই প্রকৃত শিল্পের পরিচয় নয়। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার একটা সামঞ্জস্য ঘটিয়ে যদি সুন্দর একটা কিছু সৃষ্টি করা যায় তা হলে মন্দ কি ?

আমার অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী চৌধুরী বললেন নতুন শিল্প উদ্ভাবন করতে হলে নানা দেশের প্রথা প্রকরণ গ্রহণ করতেই হবে তবে বর্তমান ইউরোপীয় শিল্পধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তার পুনরাবৃত্তি (Art Revise) করা উচিত নয় বরং দুই দেশের শিল্পের মধ্যে বিচার করে ও ভেবে চিন্তে একটা সমন্বয় ঘটান উচিত। তবেই ব্যক্তিত্বের রঙে পরিপূর্ণ হয়ে শিল্পীর রচনা নিজস্ব গৌরবে স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করে।

ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তেল রঙটাকেই আমি বেশী পছন্দ করি, তবে

জল রঙে যে আঁকি না, এমন কথা বলি না। আসলে শিল্পীর মুডই সব। শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন কিছু করা আমি পছন্দ করি না। কারণ তাতে খুব উচাঙ্গের চিত্র সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না। চিত্রকলা যে আজও কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা সঙ্গীতের সমপর্যায়ে ওঠে নি তার জন্য দায়ী আমাদের সমাজ বা বাড়ীর অভি-ভাবকেরাই, সরকার নয় বলেই শ্রীমতী চৌধুরী মনে করেন। চিত্রকলা যে আর্টের এক প্রধান অঙ্গ, এটা যদি ছেলেবেলা থেকে শেখান না হয় তাহলে তা কেমন করে সমাদৃত হয়ে উঠবে? আমার সব শেষ এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী চৌধুরী বললেন ছবির মধ্যেই আমি জীবনকে খোঁজার চেষ্টা করি। মাটির প্রতিমা যদি প্রাণ পায় তা হলে চিত্র সার্থক সৃষ্টি হলে প্রানবন্ত হয় না কি?

শ্রীমতী চৌধুরী বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন।

সাবিত্রী সরকার

ভিক্টর হুগো কোন দিন তুলি হাতে শিক্ষকের সামনে বসেন নি। সেটা তাঁর কাজের মধ্যেও ছিল না। বরং স্ত্রী ছবি আঁকতেন হুগো তা দেখতেন। বন্ধুরা আঁকেন হুগো তা দেখেন। দেখতে দেখতে নিজেও বসলেন একদিন। বসলেন বলা ভুল। চলতে চলতেই এঁকেছিলেন হুগো তাঁর প্রথম ছবি। জুলেত্তিকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন নর্মাণ্ডি এবং বিট্রানিতে। সেখানেই সুরু! শেষে তিনি ফাঁসি কাঠে ঝুলন্ত মানুষের ছবিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠলেন। এবং এমন আঁকতে সুরু করলেন, যা দেখে লোকে তন্ময় হয়ে যেত। ঐ ধরণের ছবিই এঁকেছিলেন তিনি অনেকগুলি। মহৎ প্রতিভার পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়েছিল তাঁর শুধু ঐ ছবি এঁকেই।

সাবিত্রী সরকার তাঁর ছবির বিষয়বস্তু খুঁজে নিয়েছেন নরনারীর মুখাবয়ব অঙ্কনের মধ্যেই। এবং বলা চলে তাইতেই তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। শিল্পী ব্যক্তিত্বের রসে পরিপূর্ণ হয়ে আজ তাঁর রচনাগুলি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে। রঙ দেখতে পারার ক্ষমতা, রচনাবোধ, ড্রইং করার শক্তি এঁর আছে। তেল মাধ্যমের চিত্রগুলি দেখলে তা বোঝা যায়। তাঁর কতকগুলি রচনা যেমন, কুকুর, মা ও ছেলে, সাপুড়িয়া, জেলে নৌকা প্রভৃতি বিশেষ উপভোগ্য এবং

পাকা রচনা কৌশলের যথার্থতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমতী সরকারের প্রতিকৃতি করণ কৌশল পাশ্চাত্যের কোন এক বিখ্যাত শিল্পীর রচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর রচনায় যেমন ত্রিমাত্রিক রূপের কিছুটা প্রকাশ পায় আবার ছন্দপ্রধান ও অলঙ্কারক নক্সার ভাবটাও কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিটি রেখা ও প্রতিটি বর্ণের টানটোন তাঁর একেবারে পরিমিত। শ্রীমতী সরকারের রচনার মধ্যে কোথাও অতিরঞ্জন, অনুরঞ্জন বা বিকৃতিকরণ নেই। দুই চোখে যা দেখেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাই প্রকাশ করেছেন তাঁর চিত্রে।

শ্রীমতী সরকার ১৯২৯ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তাঁদের দেশ বানরীপাড়া, বিক্রমপুর কিন্তু কার্যব্যপদেশে তাঁর পিতাকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। পিতা নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিজ্ঞানী হিসাবে তৎকালে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। মার নাম লুলুপুতুড়ি সেনগুপ্ত। তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় কন্যা। ভাই নেই, মাত্র দু বোন্। ১৯৪৬ সালে ডায়োসেসন স্কুল হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি সরকারী চারু ও কলা মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং ১৯৫১ সালে ফাইন আর্টসে প্রতিকৃতি অঙ্কন শিল্পী হিসাবে পাশ করে বেরিয়ে আসেন।

শিল্পী অতুল বসুর অধীনে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আর্টিষ্ট্রী হাউসে ১৯৫১ সালে তাঁর ছবির একটি যুগ্ম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে এ্যাকাডেমি হাউসের বার্ষিক প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয় এবং তিনি উডকাট-এ একটি রচনার জন্য প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। শ্রীমতী সরকার বৃটিশ উইমেন্স ক্লাবের শিল্প বিভাগের শিক্ষিকা ও স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের বি-টি ডিপার্টমেন্টের শিল্পনির্দ্দেশিকা হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া তিনি আকাশবাণী, কলকাতা থেকেও Children Hour-এ মাঝে মাঝে নানান বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আর্টিষ্ট্রী হাউসে যতবার

তিনি তাঁর ছবির একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন প্রতিবারই তা চিত্ররসজ্ঞ জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করে।

শ্রীমতী সরকার বিশেষ কোন রঙের প্রতি আকৃষ্ট নন। সব রকম রঙকেই তিনি কাজে লাগিয়ে থাকেন তাঁর রচনার মধ্যে। আর্টের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড় এবং শিল্পীরা সুন্দরের উপাসক বলেই তিনি মনে করেন। ছবি আঁকার পরিবেশ কিরূপ হওয়া উচিত, এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, নির্জনতা একান্তই প্রয়োজন। তবে সংসারে সব সময়ে সেটা সম্ভব নয়। যেটা না হলে নয় বলেই তিনি বিশ্বাস করেন তা হচ্ছে মনের একাগ্রতা। আমার অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, আমরা যে যুগে বা যে সমাজে বাস করছি তারও প্রতিচ্ছবি শিল্পীদের শিল্পকলায় ফুটে ওঠা উচিত বলে মনে করি। তবে শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য থাকতে পারে।

'কিন্তু আপনার ছবিতে তার প্রতিফলন কই দেখতে পেলাম না তো?'

"কেন?" শ্রীমতী সরকার বললেন 'মা ও ছেলে, সাপুড়িয়া, বধূ প্রভৃতি চিত্রগুলি তো বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবি?'

আমার সব শেষ এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, পাশ্চাত্যের হুবহু অনুকরণ করাটাকে আমি পছন্দ করি না, তবে ওসব দেশের ছাপ কিছু না কিছু এসে পড়বেই। এবং আমার মনে হয়, ছবি যাতে অসুন্দর না হয়ে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে সেদিকে দৃষ্টি রেখে চলা উচিত।

সাবিত্রী সরকার যেমন এক বিশিষ্ট পরিবারের কন্যা, তেমনি বাংলা দেশের এক স্বনামধন্যপরিবারের বধূও। স্যার নীলরতন সরকারের একমাত্র নাতি শ্রীসুমন সরকারের সঙ্গে তাঁর ১৯৫১ সালে বিবাহ হয়।

চিত্রা দত্ত

বৃক্ষ একদিনেই শাখা প্রশাখা বিস্তার করে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয় না। অগ্ন্যুৎপাত ঘটে মুহূর্তেই কিন্তু আগ্নেয়গিরির গহ্বরে তার প্রস্তুতি চলে বহুদিন ধরেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা থেকেই পরিণত হয় সুবিস্তৃত ফেনিল জলরাশি। আসলে সব কিছুর মধ্যে চলে এই প্রস্তুতি। তা না হলে প্রান্ত সীমায় পৌছে অসীমের খোঁজ পাওয়া যাবে না। কাকস্নানে অবগাহনের আনন্দ বা তৃপ্তি পাওয়া যায় না মনের মধ্যে। পরিপূর্ণতা লাভের মধ্যেই শিল্পীর সফলতা। আর এই পূর্ণতা অর্জন করার জন্য চাই বিরাট প্রস্তুতি।

একবার এক সাংবাদিকের বিশ্ববরেণ্য শিল্পী পিকাসোর স্টুডিওতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার সৌভাগ্য হয়েছিল। সাংবাদিকটি দেখলেন, পিকাসো একটুকরো কাগজের উপর কী সব আঁকিবুকি কাটছেন। পরমুহূর্তেই সেই কাগজটি রেখে অন্য একটি কাগজ টেনে নিলেন। সাংবাদিক ভদ্রলোক তখন আর থাকতে না পেরে জিগ্যেস করলেন, আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানি ছবি তো শেষ করলেন, কিন্তু ছবিটা বেচবেন কম করে ধরলেও পাঁচ হাজার ডলারে নিশ্চয়ই। পিকাসো হেসে উত্তর করলেন, পাঁচ কেন পঁচিশ হাজার ডলারেও বিক্রী হয়ে যাবে কিন্তু মনে রাখবেন, পাঁচ মিনিটে ছবি আঁকতে হয় কী করে সেটা শিখতে আমার পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় লেগেছে। মূল্য তো এই প্রস্তুতিরই। তার জন্য চাই নিষ্ঠা, সংযম ও অধ্যবসায়। কি কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক বা শিল্পী সকলেরই ঐ গুণ কয়টি আয়ত্বের মধ্যে থাকা

চাই। তবেই আসে পরিপূর্ণতা। শিল্পী চিত্রা দত্ত সেই পূর্ণতা বা সফলতা অর্জনে আজ বিশেষভাবে সক্ষম।

শিল্পীত্বের বনিয়াদ শক্ত করেই গড়ে উঠেছে তাঁর অন্তরে। পত্রে পুষ্পে সুশোভিত বৃক্ষরাজি ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়ে যেমন দৃষ্টি আকর্ষন করে পথিকের, তেমনি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা শিল্পী হিসেবে তিনি যে আজ পরিপূর্ণ মর্যাদালাভ করেছেন, চিত্ররসিক জনসাধারণ ও সমালোচকদের উচ্ছসিত প্রশংসা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবলমাত্র শিল্পের প্রতি দরদ নয়। শিল্পশাস্ত্রের গভীর অনুশীলনের প্রতি একান্ত অনুরাগের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় তাঁর চিত্রে। তাঁর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যেমন বৈচিত্র লক্ষ্য করার মত, তেমনি বিষয় নির্বাচনে, স্বাচ্ছন্দ্যমত রঙের প্রয়োগে এবং হাতের সাবলীল টানটোনে শিল্পী শ্রীমতী দত্ত বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারীণী।

পাশ্চাত্যের কোন এক প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন তিনিই হচ্ছেন মহৎ শিল্পী যিনি প্রকৃতির মাঝে যা সুন্দর, যা মানুষের মনকে ধরে নাড়া দেয়, প্রাণে আলাড়ন তোলে, চিরস্থায়ী আনন্দের আস্বাদ বহন করে আনে এবং তাকেই শিল্পরচনার মাধ্যমে ধরে রাখতে পারেন। সেই বিচারে শ্রীমতী দত্ত যে আজ সার্থক সে বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ।

বাবা ডাক্তার আর বাড়ীর অন্যান্যরাও যেখানে ডাক্তার অথবা ইনঞ্জিনিয়ার সেখানে চিত্রা দত্তের ঝোঁক কিভাবে শিল্পের দিকে গেল এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। মানুষের মন এক একজনের এক একরকম ধাতুতে গড়া। সেখানে একজনের ইচ্ছার উপরে অপর একজনের ইচ্ছাকে জোর করে চাপানো চলে না। প্রকৃতির উপর কি মানুষের খবরদারি চলে? শিল্পী তো প্রকৃতিরই অংশ। বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির মাঝে যেমন পরিবর্তনের খেলা চলে শিল্পীর মনেও তার রেখাপাত ঘটে। তাঁর আঁকা তেলরঙ এবং প্যাস্টেল ছবির মধ্যে একটি বৃদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিভাতঃ বয়সের ভারে দেহখানি অবনত, পক্ক কেশ, চক্ষুদ্বয় কোটরাগত। এ যেন মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা, মুখচর্মের

ভাঁজে ভাঁজে যেন তার মনের আশঙ্কা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। তুলির টানে ছবিখানি অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

চিত্রা দত্ত পরলোকগত চিকিৎসক জে. কে. দত্ত ও মা নিভা দত্তের পুত্র কন্যাদের মধ্যে তৃতীয়। কলকাতায় তাঁর জন্ম। ১৯৫০ সালে লেডী ব্রাবোর্ন কলেজ হতে বি. এ. পাশ করার পর Govt. Art College-এ ভর্তি হলেন এবং ১৯৫৬ সালে ডিগ্রী নিয়ে সেখান হতে বেরিয়ে এলেন। সখ হিসাবে একদিন যে শিল্পরচনাকে গ্রহণ করেছিলেন বাবা মা'র প্রেরণায় এবার তাকেই মনে-প্রাণে আঁকড়ে ধরলেন। এরপর তিনি দিলীপ দাশগুপ্তের স্টুডিওতে যোগদান করলেন।

১৯৬১ সালের শেষের দিকে ফরাসী সরকারের বৃত্তি নিয়ে তিনি প্যারিস-এ যান এবং Academy Juliar-এ সে দেশের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন। এ ছাড়াও Fresco Mural-এ বিশেষ শিক্ষা নেন অধ্যাপক Aujhame-এর অধীনে। Prof. Maccoboy-এর অধীনেও তিনি কিছুকাল শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিদেশে তাঁর একক প্রদর্শনীর যে সমালোচনা 'Arts' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল তার বাংলা তর্জমা ঃ

'প্রতিভাময়ী শ্রীমতী চিত্রা দত্ত একজন শিল্পী। এঁর প্রতিটি চিত্র থেকেই পরিণত কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর রচনা অনুকৃত নয়। ব্যঞ্জক এবং ছান্দসিক। একটি হিন্দু তরুণী তাঁর নিজস্ব স্টাইলে পারিবারিক জীবনের ছোটখাট মুহূর্তগুলিকে চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে, দেশের এবং বিদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাঙ্কণ করতে যে এত পারঙ্গমা তা তাঁর চিত্র না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। অয়েল, ওয়াটার এবং প্যাস্টেলে শিল্পীর দক্ষতা সমান। শিল্পীর রসবোধেরও প্রশংসা না করে পারা যায় না।'

শ্রীমতী দত্তের নিজস্ব মত হল, "যে সমাজে আমরা বাস করছি, যে যুগে আমরা বাস করছি তারই প্রতিচ্ছবি শিল্পীদের শিল্পকলায়

ফুটে উঠা উচিত, কারণ শিল্পের মধ্যে দিয়েই ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন ইলোরা, অজন্তা বা নালন্দার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় তৎকালীন গড়া ভাস্কর্য এবং আঁকা চিত্রের মাধ্যমে। তবে বাস্তবের নিছক অনুকৃতিকরণই প্রকৃত শিল্পের পরিচয় নয়, কারণ তাতে Painting quality নষ্ট হয়ে যায় এবং জিনিসটাও ফটোগ্রাফী হয়ে ওঠে।"

শ্রীমতী দত্তের মতে রঙ-তুলির যথাযথ ব্যবহারই ছবির বিষয়বস্তুকে সুন্দর করে তোলে। অতিরিক্ত পরিশ্রম করা কখনও উচিত নয়। সব কিছুর মধ্যে যেমন সুরু আছে, তেমনি বিশ্রামও আছে। ছবির বেলাতেও তাই। শিল্পীর যেমন জানা উচিত কোথায় সুরু হচ্ছে তেমনি কোথায় এবং কেমনকরে তাকে থামতে হবে তাও জানা উচিত।

আমার অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী দত্ত বললেন, "আর্টের সঙ্গে সুন্দরের সম্বন্ধ অতি নিবিড়। তবে সুন্দরের কোন নিজস্ব ফর্ম আছে বলে আমার জানা নেই, কারণ ওটা একটা রিলেটিভ টার্ম অর্থাৎ আমার চোখে যেটা ভাল আপনার চোখে সেটা ভাল নাও লাগতে পারে।"

পাশ্চাত্য শিল্পে বিশেষ শিক্ষা অর্জন করেও ভারতীয় বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই ছবি আঁকার দিকে শিল্পী বেশী আগ্রহান্বিত। কারণ তাঁর মতে, পাশ্চাত্যের দেশগুলির চিন্তা ও ভাবধারা বর্তমান ছবির মান উন্নয়নে অনেকখানি সহায়তা করেছে।

ছবি আঁকার 'মুড'কে তিনি প্রাধান্য দিলেও আবেগের বশবর্তী হয়ে সব সময়ে তিনি কাজ করেন না। যখন যা কিছু তাঁর চোখে সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়, তখনই তাঁর হাত ও তুলির মিলন ঘটে। তার জন্য নির্জনতা বা বিশেষ কোন পরিবেশের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। শিল্পী নিজে বাস্তববাদী এবং প্যাস্টেলের দিকেই তাঁর বেশী আগ্রহ।

শ্রীমতী দত্ত বর্তমানে 'বিহারীলাল হাউস অব্ সায়েন্স'-এর শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

অরুন্ধতী রায়চৌধুরী

শিল্পীর জীবনবোধ ও উপলব্ধি এবং নানা রংয়ের যথাযথ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চয়ই যে সাফল্যের হেতু, অরুন্ধতী রায় চৌধুরী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীমতী রায়চৌধুরী ১৯৩৫ সালে কলিকাতায় এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা

অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং মাতা শোভারানী ঘোষের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে তিনি পঞ্চম। দশ বৎসর বয়সে চিত্রাঙ্কনের প্রতি ঝোঁক দেখা দিলেও পারিবারিক ঐতিহ্যের জন্য তাঁকে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হয়। ১৯৫০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হতে বি-এ পাশ করার পর তিনি আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং সেখান হতে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করতে থাকেন। এর কিছু পরেই, অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সঙ্গীততীর্থ উপাধি লাভ করেন এবং আজো পর্য্যন্ত কলকাতার বেতার কেন্দ্রের একজন নিয়মিত শিল্পী ব'লে পরিগণিত। কিন্তু গান-বাজনা বা লেখাপড়ার দিকে মনোনিবেশ করলেও চিত্রকলার প্রতি অবহেলা কোনদিনই করেন নি। ১৯৫৫ সালের পর তিনি সরকারী আর্ট কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৬০ সালে সেখান থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে বেরিয়ে আসেন। ঐ বছরই আবার তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন Art Appreciation course-এ সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তারপর পুরোদমে তাঁর চলে চিত্রকলার নিত্য নূতন পদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী কলকাতা দিল্লী প্রভৃতি বহু জায়গায় অনুষ্ঠিত

হয় এবং কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য তিনি পুরস্কৃতও হন। ছবি আঁকার বিষয়বস্তুর জন্য তিনি উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত এবং হিমালয়ের সমতল ভুক্ত স্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁর অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনী যথেষ্ট সফলতার সম্মুখীন হ'তে সমর্থ হয়। কলারসিক সমাজে তাঁর চিত্র প্রদর্শনী বিপুল সাধুবাদে ভূষিত হয়। এ প্রসঙ্গে ষ্টেটসম্যান বলেন—

'She makes these sketches of fantastic shapes of instant impact and of tragic sincerity with the simplest of means ; accurate black lines and dramatic shadows।" অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন—"Her pictures throb with hope and joy which seem to gleam and sparkle from every corner of her canvas।" সম্প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের চিত্রকলা সম্বন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য, বিশেষ ক'রে ইউরোপীয় চিন্তাধারায় সম্প্রতি যে চিত্রকলার জন্ম তারি সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করেন।

তাই চিত্রাঙ্কনের বিভিন্ন দিক নিয়ে শ্রীমতী রায়চৌধুরীর নিজস্ব মতামত জানার আগ্রহ নিয়ে গেলাম তাঁর বাড়ী। আমার প্রশ্নের উত্তরে মোটামুটি তিনি যা বললেন, তা হচ্ছে, যে যুগে আমরা বাস করছি, তার হুবহু প্রতিচ্ছবি শিল্পীদের শিল্পকলায় যে সব সময় ফুটে উঠবে এমন কোন কথা নেই। কারণ, আর্ট এমন একটা জিনিস, যেখানে জোর করে কিছু করা চলে না। কারণ, বাস্তবের নিছক অনুকৃতিকরণই প্রকৃত শিল্পের পরিচয় নয়। সমাজে হিংসা, দ্বেষ, লোভ এতো আছেই। তা ছাড়া আছে ধর্মগত, জাতিগত, দেশগত সংস্কার। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে সুন্দর যে জিনিসটা আছে— শিল্পী তাকেই লক্ষ্য করে থাকেন, কারণ আর্টের সঙ্গে সুন্দরের সম্বন্ধ অতি নিবিড় আর শিল্পীরা হচ্ছে সেই সুন্দরের উপাসক। তাই ইতিহাসের ধারায় ভারতীয় শিল্পকলার বিশেষ একটি আসন আছে।

বিশ্বসভায় সে কারো ছোট নয়। যদিও পাশ্চাত্যের শিল্পকলা বর্তমানে অনেক অগ্রসর, তাদের কাছ হতে শেখার বা জানার অনেক কিছুই আছে তবুও নকল করা আমাদের উচিত নয়। বরং দুটোকে ভালবেসে, জেনে, মনের মধ্যে দুটোর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নিজের তুলিতে ও রেখায় ভারতীয় ঐতিহ্যকে প্রকাশ করাই উচিত। রং ও রেখার ব্যবহার ছবিতে যত কম করা যায় ততই ভাল বলে মনে করি। কারণ নিজের মনের ভাবকে যদি জালের আবরণে ঢেকে রাখা যায় তাহলে দর্শকের আনন্দ কোথায়। অনাবশ্যক রেখা ত্যাগ করে Simplified way বা পরিমিতভাবে Suggestion দেওয়া উচিত তবে ছবির বিষয়বস্তু যেন ঠিক থাকে।

আমার পরের একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন প্রকৃতি নিজেই একজন সেরা শিল্পী। তাই প্রকৃতিকে পুরোপুরি অনুকরণ না করে তারি ছবি বা ভাব মনের মধ্যে গ্রহণ করে তাকে অনুসরণ করা উচিত। কারণ, প্রকৃতির ঐ বিশাল রূপ—যেমন সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত বা সমুদ্রের গভীরতাকে অতটুকু ক্যানভাস-এ দেখান তো সম্ভব নয়ই উপরন্তু ঐ বিশালতা মানুষের দেখাবার ক্ষমতাই বা কোথায়। শিল্পীর উদ্দাম ও বাঁধনহারা আবেগই তার হাত ও তুলির মিলন ঘটায় বলে আমি মনে করি। অসাধারণ নয়, মানুষের অতি সাধারণ সুখ, দুঃখ, ব্যথা ও বেদনা শিল্পীকে প্রভাবিত করে। তারি মধ্যে পায় ছবির উপাদান। ছবি আঁকার জন্য 'মুড'কে আমি অত্যন্ত প্রাধান্য দিই। কারণ মুডই সমস্ত সার্থক ছবির পেছনে খেলা করে। অতি সাধারণ পরিবেশই ছবি আঁকার জন্য যথেষ্ট তবে নির্ভুলতা একান্ত প্রয়োজন।

আমার শেষ প্রশ্ন ছিল তাঁর কাছে,—জীবনের মধ্যে আপনি ছবি দেখতে পান, না ছবির মধ্যে জীবনকে খুঁজে পান? একটু ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, "জীবনের মধ্যে আমি ছবি দেখতে পাই, কারণ মানুষের হাসি, কান্না সুন্দর, অসুন্দর এগুলোইতো আসল ছবির বিষয়বস্তু।

মৈত্রেয়ী সেনগুপ্ত

আমাদের দেশের কোনও একজন প্রখ্যাত ভাস্কর এবং শিল্পী পাশ্চাত্যের দেশগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পাশপোর্ট ইত্যাদি করার পর গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন তার আশীর্বাদ পাবার আশায়। কিন্তু পরিবর্তে পেলেন ভৎর্সনা। শিল্পগুরু বললেন, দেশের সব কিছু কি তোমার জানা হয়ে গেছে যে বিদেশ থেকে সংগ্রহ করতে চলেছ? ছেলেটি মুখ নীচু করেই রইল। শিল্পগুরু তখনও বলে চলেছেন যাও, দেশের এদিক ওদিক ঘোর। অনেক কিছু দেখতে পাবে, অনেক কিছু জানতে পারবে। বলে তিনি থামলেন।
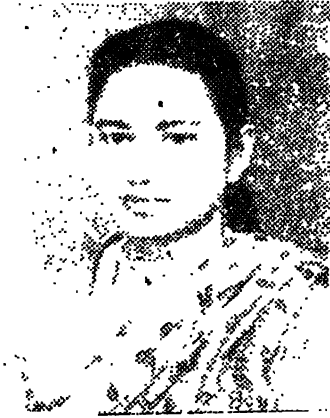
একটু আগে যে ছেলেটি এসেছিল অত্যন্ত খুশী মন নিয়ে এবার সে চলে গেল ততোধিক দুঃখ নিয়ে। তবে গুরুর কথা তিনি অমান্য করেননি বর দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তিনি ঘুরলেন। পরে অবশ্য এই শিল্পী বহুবার পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন, কিন্তু সেদিনের সেই গুরুর কথা কোনদিন ভোলেননি জীবনে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, দেশের মাটি বা আত্মার সঙ্গে যে শিল্পের যোগ নেই তা যতই সৌন্দর্যমণ্ডিত হোক না কেন. ব্যাপকভাবে সে দেশের জনসাধারণের অন্তর জয় করতে তা সক্ষম হয় না। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, 'সত্যপীরের মাটির ঘোড়া, কালীঘাটের পট, পুরাণো বাংলার দশভূজা এর একটাও নিছক কাল্পনিক বস্তু

নয়। এরা সবাই বাস্তবকে ধরে প্রকাশ হল।' এ হেন শিল্প গুরুর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে মৈত্রেয়ী সেনগুপ্ত তাদের মধ্যে একজন।

১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁর কাছে শিল্প শিক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর আশীর্বাদলাভে ধন্য হয়েছিলেন। তা ছাড়া শিল্পাচার্য নন্দলাল, সুরেন কর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীরও সংস্পর্শে এসে জীবনে চিত্রাঙ্কণের ভিতকে সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন। তাই তাঁর ছবির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, দেশীয় আচার ব্যবহার, দেশের মানুষের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত ঘটনাবলী। পাশ্চাত্যের কোন একজন ভাবুক বলেছিলেন "যে শিল্পী মানুষ হিসাবে তাঁহার ধ্যান ধারনা লইয়া শিল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন না বরং দেশের বা জাতির প্রতিনিধি বা একটা সচেতন কেন্দ্র হইয়া রচনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, শিল্পী হিসাবে তখনই তিনি সার্থক এবং তাহার শিল্প সৃষ্টির আবেদন তখন সকল দিকে ছড়াইয়া পড়ে।" শ্রীমতী সেনগুপ্ত সেই জাতের শিল্পী।

শ্রীমতী সেনগুপ্ত কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কুমুদকান্ত সেন একাউন্ট্যান্ট জেনারেল পদ থেকে ডেপুটি অডিটার জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন। মা লীলা সেন, সমাজসেবিকা মীরা দত্তগুপ্তার বড় বোন: তিন বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে শ্রীমতী সেনগুপ্তের অপর দুই বোন এফ-আর-সি এস ও দুই ভাইও উচ্চশিক্ষিত। বাড়ীতে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা বহুদিন ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল তাই শিশু মৈত্রেয়ীকে প্রভাবান্বিত করে তুলল। পত্রে-পুষ্পে সুশোভিত হয়ে বৃক্ষ যেমন নিজেকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করে, মৈত্রেয়ীও তেমনি নাচে, গানে, অঙ্কনে ও পড়াশুনায় নিজেকে বিকশিত করে তোলার প্রয়াসে ব্রতী হন। যদিও পরবর্তী জীবনে অঙ্কনের জন্য তাঁকে সব ত্যাগ করতে হয়েছে তবুও যাকে আঁকড়ে ধরে রইলেন

প্রস্ফুটিত শতদলের মত তারি সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিলেন রুচিবান দর্শকদের মধ্যে।

দিল্লীর লেডী আরউইন গার্লস স্কুল থেকে ১৯৪৮ সালে পাশ করে ১৯৪৯ সালে মৈত্রেয়ী মীরাণ্ডা হাউসে বি-এসসি পড়ার জন্য ভর্তি হলেন। কিন্তু অগ্রসর হতে পারলেন না। কারণ সেই বছরই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তিনি। তাঁর স্বামী রণেন্দ্র সেনগুপ্ত কোন একটি ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শুধু তাই নয়, সে পরিবারেরও প্রত্যেকের ছিল উচ্চশিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ। শ্রীমতী মৈত্রেয়ীর শ্বশুর মহাশয় ছিলেন তৎকালীন জেলা জজ। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারকল্পে তাঁর বহু অবদান আছে। তাই স্বামী গৃহে আসার পর লজ্জা ও সঙ্কোচের যে আবরণ টেনেছিলেন মুখের উপর তিনিই তাকে উন্মোচিত করে দিলেন। পুত্রবধূরূপে প্রাপ্য অজস্র স্নেহ ও কন্যাবৎ আদেশ বর্ষিত হল তাঁর উপর। ভর্তি হলেন তিনি কলকাতার শিল্প-মহাবিদ্যালয়ে। আনন্দ ও গর্বে ভরে উঠল তাঁর বুক। দ্বিগুন উৎসাহে ছবি আঁকতে লেগে গেলেন। গৃহে প্রতাপচন্দ্র সেন ও পরে ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে যে অঙ্কন শিক্ষা শুরু হয় ইণ্ডিয়ান পেণ্টিং বিভাগে সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আসার পর তার উন্নতি ঘটে। তাই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্নেহ ও উৎসাহ তাঁর জীবনে কখনও ভোলার নয়। ১৯৫৪ সালে তিনি সেখান হতে পাশ করে বেরিয়ে এলেন এবং সেই বছরই আর্ট এ্যাপ্রেশিয়েশন কোর্সের পাঠও সমাপ্ত করলেন। শিক্ষাধীন থাকাকালীনই শ্রীমতী সেনগুপ্ত বহু জায়গা হতে পুরস্কার ও প্রশংসালাভ করেছিলেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৫৩ সালে কলকাতায় যে 'ইণ্ডিয়া ম্যানসক্রিপ্ট ম্যাগাজিন' বিষয়ে প্রদর্শনী হয় তার মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান পেন্টিং-এ' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ও রৌপ্যপদক পান। ১৯৫৬ সালে কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে বাৎসরিক কারু ও শিল্পকলা বিষয়ে যে প্রদর্শনী হয় সেই প্রদর্শনী

থেকে তাঁকে দুটি বিষয়ে বিশেষ প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। ১৯৫৩ সালে পাতিয়ালা সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কারিগরী শিল্প প্রদর্শনীতেও প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ১৯৫৪* সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত কাপড়ের উপর বিভিন্ন প্রকারের নক্সা প্রদর্শন প্রতিযোগিতায় তিনি তৃতীয় পুরস্কার পান। ছাত্র সংহতি কর্তৃক আয়োজিত অলইণ্ডিয়া ম্যানসক্রিপ্ট ম্যাগাজিন এবং আর্ট এক্সিবিশনেও তিনি পদকপ্রাপ্ত হন।

১৯৫৬ সালে মৈত্রেয়ী দেবী ও আরো কয়েকজন মিলে 'কলাভারতী' প্রতিষ্ঠা করেন ও সামান্য বেতনে ছাত্রীদের সেখানে শিল্পশিক্ষা দিতে থাকেন।

শ্রীমতী সেনগুপ্ত জলরঙে ছবি আঁকতেই বেশী ভালবাসেন। আখ্যান-বস্তু বাছাই করতে তাঁকে চিন্তা করতে হয় না। যা দেখেন তাকেই চিত্রে রূপ দেন। কখনও প্রকৃতির দৃশ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে কখনও নরনারীর মুখশ্রীতে আবার কখনও বা পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে ইনি বর্ণনীয় বিষয় খুঁজে পান। কেমন করে রচনা করলে উপাদানগুলি সুসংস্থিত হয়, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের ভাব বজায় থাকে সে জ্ঞানও তাঁর পরিণত। তাঁর অঙ্কিত 'আলেখ্য দর্শন,' 'নিরালায়,' 'যাযাবরের গৃহস্থালী' প্রভৃতি চিত্রগুলি এক কথায় মনোরম। যেন স্বদেশের মাটির সঙ্গে তাঁর ছবির আত্মা সম্পূর্ণ এক হয়ে গেছে। এ ছাড়া শিরিষ কাগজ বা ব্লটিং পেপারের উপর অঙ্কিত চিত্রগুলিও তাঁর শিল্প কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। বাটিকের কাজ এবং চামড়ার কাজেও শিল্পীর সুন্দর হাতের নিদর্শন পাওয়া যায়।

চিত্রাঙ্কনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী সেনগুপ্ত বললেন, ছবি আঁকার জন্য নির্জন পরিবেশই আমি পছন্দ করে থাকি। এবং বর্ষাকালই আমার প্রিয়। ছবি আঁকার জন্য মনের মধ্যে আবেগ না এলে তা সম্ভব হয় না। শিল্পের সঙ্গে সুন্দরের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। এবং শিল্পী সব সময়েই সুন্দরের উপাসক বলে আমি মনে

করি। শিল্পীদের উচিত আমরা যে যুগে বা যে সমাজে বাস করি তারই প্রতিচ্ছবি তাঁর শিল্পের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা। তাতে একদিকে যেমন জাতির সেবা করা হবে, অন্য দিকে তেমনি ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রেখে যাওয়া যাবে।

আমার সব শেষ প্রশ্ন, আজকাল শিল্প জগতে দুই ভিন্নমতাবলম্বী দলের সন্ধান পাওয়া যায়। একদল চান আমাদের অতীত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে, অপর দল চান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই দেশের শিল্পের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন কিছু করতে। আপনি কোন মতাবলম্বী?

উত্তরে শিল্পী বললেন, কোন মতাবলম্বীই আমি ঠিক নই। যদিও আমি ইণ্ডিয়ান পেন্টিং বিভাগের ছাত্রী তবু প্রয়োজনমত পাশ্চাত্যেরও কিছু গ্রহণ করে থাকি।

উমা সিদ্ধান্ত

একদিকে চিত্রকলা এবং অপরদিকে ভাস্কর্য এই দুয়েরই সংমিশ্রণ ঘটেছে এমন একজনের মধ্যে, বাংলা দেশ কেন সারা ভারতে এ রকম মহিলা শিল্পীর সংখ্যা খুবই কম। পাশ্চাত্যে অবশ্য এ রকম বহু শিল্পীই আছেন এবং দেশে বিদেশে সুনামও অর্জন করেছেন অনেকে।

তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত বেটি ড্যাভেন, হান্টিটন, লালা কুন্‌ভেরি ইত্যাদি। কিন্তু এদেশে বিরল মহিলা শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে চিহ্নিত শ্রীমতী উমা সিদ্ধান্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এখানে বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না ভাস্কর্যের জন্মলাভ ঘটেছিলো বহু পুরাকালে গুহা মানবদের মধ্যে থেকে। তারা একটুকরো প্রস্তরখণ্ডকে ঘষে ঘষে অস্ত্ররূপ দিত। সে অস্ত্রও হোত নানান ধরণের। তাই দিয়েই তারা জঙ্গলের দুর্ধর্ষ প্রাণীদের কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করত। তারপর, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ভাস্কর্য এখন বিশিষ্ট শিল্পকলার অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যদিও বহু পুরাকালে ভাস্কর্য ও চিত্রকলা একই সঙ্গে পা ফেলে চলেছিল (যেমন খাজুরাহো ও কোনারকের মন্দির) কিন্তু মধ্য কালে সাহিত্যের দিগন্ত প্রসারিত হওয়ায় চিত্রশিল্প সাহিত্যিক ভাব প্রকাশের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় যার ফলে একদিকে যেমন সাহিত্যের সঙ্গে

চিত্রশিল্পের হয় ব্যাপক প্রসার ও প্রগাঢ় মিলন অপরদিকে ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের মধ্যে গড়ে ওঠে বিভেদের প্রাচীর। বর্তমানে বিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্কারগুলির মাধ্যমে এই তিন শিল্প আবার স্ব স্ব ভূমিকায় আসতে পেরেছে এবং একত্রে শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে। তাই ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে আজ যে একটা নবজাগৃতি এসেছে তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। উমা সিদ্ধান্ত এই উভয় শিল্পেই পারদর্শিতা অর্জন করেছেন।

তাঁর প্রকৃতি বা নেচার থেকে নির্ব্বাচিত শিল্প সৃষ্টগুলি প্রকৃতির বিশুদ্ধ রূপের প্রকাশ। তাঁর কতকগুলি শিল্পকর্ম প্রতীক ধর্মী ভাস্কর্যের নিদর্শন হলেও সাধারণের কাছে মোটেই দুর্বোধ্য ঠেকে না। বিশেষ করে কলকাতায় হাজরা পার্কের মধ্যে উন্মুক্ত নীলাকাশের নীচে শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশায়ে হাতুড়ি এবং ছেনীর আঘাতে 'মাতা ও পুত্র' নামে যে অনবদ্য শিল্প রচনা করেছেন, তা এত সুন্দর ও কমনীয় যে দর্শকচিত্ত আপনা আপনিই সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। পাথরের কঠিন অবয়বের মধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন একদিকে ভালবাসা অপর দিকে শান্তি। জীবন সম্পর্কে গভীর মমতা বা দরদ না থাকলে ভাস্কর্যের মধ্যে এতখানি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ভাস্কর্যে যেমন, চিত্রাঙ্কণেও শ্রীমতী সিদ্ধান্ত অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। সম্পূর্ণ প্রাচ্যমতে তাঁর আঁকা ছবিগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে সাধারণ দর্শক-দেরও বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে হয় না। মনশ্চক্ষে শিল্পী যা দেখতে পান সেইটিকে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের সামনে তাঁর অনুভূতিশীল ও কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচিতি প্রকাশ করেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন, রঙের নির্বাচন ও প্রয়োগেও এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করার কৃতিত্বের জন্য শিল্পী উমা সিদ্ধান্তের ছবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বার্গসোঁ রম্যকলা সম্বন্ধে সাধারণভাবে এক জায়গায় বলেছিলেন,

"Art reveals in things a great number of qualities and finer shades than we ordinarily discover in them." শ্রীমতী সিদ্ধান্তের শিল্পকর্ম যে উপরোক্ত কথাগুলির যথার্থতা প্রমাণ করে সেই বিষয়ে সকলেই একমত। আমাদের দেশে প্রত্যেকটি সংবাদপত্র ও কলা সমালোচকগণ তাঁর ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

শ্রীমতী সিদ্ধান্ত ১৯৩৩ সালে বরানগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতামহ ঢোল এণ্ড কোং-র প্রতিষ্ঠাতা বানওয়ারীলাল ঢোল। পিতা শচীন্দ্রনাথ রায় ও মা বিভাবতী দেবীর তিনি সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে ১৯৫১ সালে সরকারী চারু ও কলা মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং Sculpture ও Model বিষয়বস্তু নিয়ে ১৯৫৬ সালে পাশ করেন। এ ছাড়া নৃত্যভারতী হতেও পাঁচ বৎসর শিক্ষানবিশ থাকার পর চিত্রণ ও সূচীশিল্পে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। ১৯৫২ সাল থেকে অর্থাৎ সি এল টি শুরু হবার পর হতেই উমা দেবী শিল্পী ফণিভুষণের সহযোগী হিসেবে ঐ প্রতিষ্ঠানের শিল্পনির্দ্দেশকের কাজ করেন পুরা তিন বৎসর। ওয়াই ডব্লু, সি এ-তেও তিনি কিছুকাল শিল্প শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। এখানে বিশেষ করে বিদেশীদের শিক্ষা দেওয়া হত। ভাস্কর্য ও চিত্রকলা ব্যতীত তিনি বাটিক, চামড়ার কাজ, মণিপুরী সূচীশিল্প, বিভিন্ন ধরণের বাঁশের ও কাঠের কাজেও তিনি নৃত্যভারতী হতে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন• এবং দক্ষতারও প্রমাণ দিয়েছেন প্রচুর। প্রমাণ স্বরূপ ১৯৫৩ সালে এ্যাকাডেমি হাউসের বার্ষিক প্রদর্শনীতে তাঁর একটি ভাস্কর্যের জন্য বিড়লা স্বর্ণপদক লাভ করে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করেন। ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের শ্রেষ্ঠ ডিজাইন নির্মাতা হিসাবেও তিনি পঁচাত্তর টাকা আর্থিক পুরস্কার লাভ করেন। বহু প্রতিষ্ঠান থেকেও তিনি তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যের জন্য প্রশংসাপত্র লাভ করেন। বর্তমানে তিনি

'মহাদেবী বিড়লা বিদ্যাবিহারের' শিল্প শিক্ষিকা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁর পাঁচজন ছাত্রী বিদেশে পোলিশ রেডিও কর্তৃপক্ষ আয়োজিত All World Child Competition-এ তাদের শিল্প কৃতিত্বের জন্য বিশেষ প্রশংসাপত্র লাভ করেছে। শ্রীমতী সিদ্ধান্ত ওয়াশ, টেম্পেরা এবং জলরঙের মাধ্যমে ছবি এঁকে থাকেন। রঙ হিসেবে তাঁর পছন্দ এমারল্ড গ্রীণ, ইণ্ডিয়ান রেড এবং গ্রে।

ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্প এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টাকে বেশী প্রিয় বলে আপনি মনে করেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী সিদ্ধান্ত বললেন, ভাস্কর্যের মধ্যে একটা thrill আছে এবং যার জন্য আলাদা ধরণের আনন্দ অনুভব করে থাকি। চিত্ররচনা কে বলা চলে হবি হিসাবে গণ্যকরে থাকি যদিও গভীর মনঃসংযোগ উভয়েতেই প্রয়োজন এবং তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রতিটি সার্থক শিল্পকর্মের পিছনে খেলা করে।

আচ্ছা আর্টের সঙ্গে সুন্দরের কোন সম্বন্ধ আছে কি এবং শিল্পী কি সুন্দরের উপাসক? দেখুন, শ্রীমতী সিদ্ধান্ত বললেন, সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। তবে সব সময়ই লোকের গ্রাহ্য-অগ্রাহ্যের উপর শিল্প সৃষ্টির মান নির্ভর করে না। এমন অনেক ছবি আছে যেগুলো সাময়িকভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও কালের গতিতে একদিন তা বিলীন হয়ে যাবে। আবার এমন অনেক ছবি আছে যা লোকের মনে সঙ্গে সঙ্গে কোন রেখাপাত না করলেও অনাগত পৃথিবীর কাছে তার জন্য তোলা থাকবে প্রচুর অর্থ, যশ, মান। এক কথায় সৌন্দর্যের নিজস্ব কোন মাপকাঠি নেই বলেই আমি মনে করি। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যে উনবিংশ শতাব্দীতে কোন ছবি অসুন্দর বলে লোকে গ্রহণ করেনি কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আওতায় এসে অর্থাৎ শিল্পী মারা যাওয়ার বহু পরেও তার সেই ছবি পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। আমার অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, আমরা যে যুগে বা

যে সমাজে বাস করছি তার প্রতিফলন শিল্পকলায় যেমন ফুটে উঠা উচিত তেমনি আমাদের অতীত ঐতিহ্যকেও ভুললে চলবে না। নির্জনতা যেমন শিল্পীদের প্রয়োজনীয় তেমনি 'মুড' না এলে ছবি আঁকা হয় না বলে শিল্পী মনে করেন।

শ্রীমতী উমা সিদ্ধান্ত ১৯৫৫ সালে অধ্যাপক সুনীল সিদ্ধান্তের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন।

মায়া রায়

দেয়ালে ছবি, আলমারিতে ছবি, সোফার উপর ছবি, খাটের উপর সত্ত কিনে আনা কয়েকখানা কাপড় তার উপরও রয়েছে ছবির প্রাথমিক কাজ। শিল্পী যে ঘরে নেই মনেই হয় না বরং বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না যে ঘরের সর্বত্র যেন শিল্পী বিরাজমান। তিনি মিলে মিশে ছড়িয়ে রয়েছেন ছবির মধ্যে। ভরিয়ে তুলতে শিল্প সন্দর্শনে আসা আগন্তুকদের মন। প্রাণ দিলেই তো প্রাণ পাওয়া যায়, যেমন মনের বদলে মন। নিজে ভাবতরঙ্গে ডুব দিতে না পারলে অপরের অঙ্গে অঙ্গে ভাবতরঙ্গ খেলা করবে কি করে? ফুল ফোটে, পাখী গান গায়, ভোরের শিশির পড়ে সবুজ ঘাসের উপর এগুলো আমরা প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু ছবির মধ্যেও তারা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, শিল্পী যখন আপন প্রাণ

তাতে ঢেলে দেন। বাঁশী হাতে থাকলেই হয় না। বাজাতে জানতে হয়, মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হয় তবেই তা সুর তোলে। ডাক দেয় পাঁচজনকে। শিল্পীও তো তাই। তুলি হাতে ধরলেই তো চলবে না। তাকে চালাতে জানতে হবে, মনের একদিকের অর্গল রুদ্ধ করে। আসলে শিল্পী ও শিল্প বা শিল্প এবং শিল্পী দুয়ে দুয়ে এক। না হলে একাধিক মন জয় করবে কি করে? শিল্পীর চোখ তো আর শিল্পী নয়, মনই শিল্পী। শিল্পের রস গ্রহণও চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে।

কারণ প্রকৃতির অপরূপ লীলা বৈচিত্রের মধ্যে কখনও সেই মন সন্ধান করে রূপের, কখনও বা রসের। শিল্পীদের এমনই একটা জিনিসের রূপ দিতে হয় যা একটা জাতি বা যুগের পক্ষে সহজবোধ্য হয়। কারণ আর্টের উৎপত্তিই হল, Art is as we have seen, social in origin, it remains and must remain social in function। কথাগুলো যে কতটা সত্য তা উপলব্ধি করলাম মায়া রায়ের বিভিন্ন ধরণের শিল্পের মাধ্যমে। দেশের মাটিকে, দেশের মানুষকে তার ভাষাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই তো এ ধরণের চিত্র উপহার দেওয়া সম্ভব। কবি যেমন তার কবিতায়, লেখক যেমন সাহিত্যে, শিল্পী তেমনি তার রঙ অর্থাৎ তুলি ও রেখায়, ভাবে ও রসে প্লাবিত করেন। এদের উদ্দেশ্য সকলেরই এক, কিন্তু মাধ্যম ভিন্ন এবং এই প্রকাশ তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন শিল্পীর চেতনায় সমাজ মনের ভাব ভাবনাগুলি নিরক্ষণ যাতায়াত করে। কারণ শিল্পীরা তো আর সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই সমাজের সঙ্গে যে শিল্পী যত ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত, তাঁর প্রকাশ তত সুন্দর ও যথার্থ। আর দর্শকেরাও তখন ক্ষণকালের জন্য সব কিছু ভুলে শিল্পীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন। শিল্পীর সার্থকতা সেইখানেই। মায়া রায়ের ছবির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তারই অভিব্যক্তি। নিজের অবসর বা ভাব বিনোদনের জন্যেই তিনি শিল্প রচনা করেননি। তাঁর সৃষ্টি অপরের মনে সত্যিকারের যাতে আসন লাভে সমর্থ হয় তারই জন্য তিনি ব্যগ্র।

কী অপরিসীম পরিশ্রম এবং অধ্যবসারের দ্বারা শুধুমাত্র তুলির টানে একখানি বস্ত্রখণ্ডের উপর যে অপরূপ রূপলাবণ্য তিনি সৃষ্টি করেছেন তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। শিল্পীর কাছ থেকে জানতে পারলাম সরকারের পরামর্শক্রমে কিছুকাল আগে ভারত দর্শনে আগত রাণী এলিজাবেথকে দেওয়ার উদ্দশ্যে এটি তৈয়ারী হয়। শুধু একখানি নয়, ঘরের মধ্যে এলোমেলো ভাবে ছড়াণো রয়েছে আরো অনেকগুলি। কাপড়ের উপর এমন নিখুঁত রঙের কাজ

সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। শিল্পীর সঙ্গে কথায় কথায় জানতে পারলাম সরকারী চারু ও কলা মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন তিনি ১৯৪৭ সালে অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অধীনে ভারত শিল্পের ছাত্রী হয়ে। তাঁর জীবনের স্মরণীয় যে জিনিসটি, তা হচ্ছে ঐ কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনীতে অধ্যক্ষ মহাশয় কর্তৃক তাঁর প্রথম ছবি ক্রয়।

নিজের হাতে আঁকা ছবির প্রথম বিক্রয়ের অভিজ্ঞতা কী রকম জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, সে এক অভূতপূর্ব আনন্দ। প্রথমত আমার ছবি যে অন্যের ভাল লেখেছে এবং দ্বিতীয়ত হাতে টাকা পাওয়া সত্যি সে যে কী আনন্দ তা বলে বোঝাতে পারব না। এর পর বহু জায়গাতেই তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছে, যেমন তৎকালীন ন্যাশনাল এ্যাকাডেমী, দিল্লীর আর্ট এণ্ড ক্র্যাফটস্ সোসাইটি, ললিতকলা এ্যাকাডেমী এ্যাকাডেমী অব্ ফাইন আর্টস, পাটনায় ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটিতে, কাশ্মীর প্রভৃতি বহু জায়গায় এর জন্য প্রশংসাপত্রও যেমন পেয়েছেন, তেমনি অর্থও পেয়েছেন। প্রশ্ন করলাম সবচেয়ে বেশী টাকায় আপনার কোন ছবি বিক্রী হয়েছে এবং তাঁর ক্রেতা কে? শ্রীমতী রায় বললেন, ছবিটির বিষয়বস্তু ছিল কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন এবং এটি কিনেছিলেন কাশ্মীরের যুবরাজ সাড়ে সাতশ টাকায়। রৌপ্যপদকও তিনি অর্জন করেছেন তাঁর অন্য একখানি ছবির জন্য।

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, শিল্পীরা পরিবর্তনশীল তো হবেনই, কারণ প্রকৃতির রূপ বদলানোর মাঝে শিল্পী যে বৈচিত্র্যের সন্ধান পান, তাই তাকে পরিবর্তনের পথে টেনে নিয়ে যায়। আনন্দও পাওয়া যায় তার মধ্যে।

শিল্পীরা কি নির্জনতা পছন্দ করেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, মনের একাগ্রতা রাখবার জন্য নির্জনতাটা একটু হলে ভাল হয় বৈকি, কিন্তু ঘরের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বললেন, দুখানি তো

মাত্র আছে। তার মধ্যেই ঘর সংসার, আঁকা' লোকজন এলে বসতে দেওয়া সব কিছুই। সুতরাং তা আর হয়ে ওঠে না।

শ্রীমতী রায় জল রঙেই বেশী ছবি করে থাকেন, টেম্পেরাতেও মাঝে মাঝে কাজ করেন। এ ছাড়া ক্র্যাফটের কাজও তিনি করে থাকেন। তাঁর প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে ভারতীয় করণ কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাতে শিল্পী চমৎকারভাবে আপন ব্যক্তিমানসকে প্রকাশ করেছেন। তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা প্রকাশও করেছেন অত্যন্ত সাধাসিধাভাবে। অত্যুক্তি এঁর রচনার মধ্যে নেই বললেই চলে। তুলি এবং রঙের উপরও যে এঁর দখল আছে এবং ছবিগুলিও কষ্টকল্পিত না হয়ে সত্যিকারের যেভাবে স্বতঃস্ফুর্ত্ত হয়ে উঠেছে, তা সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁর ছবি চীন ও রাশিয়াতেও প্রদর্শিত হয়েছে এবং স্থানীয় জনসাধারণ ঔৎসুক্যভরে কিছু কিছু ক্রয়ও করেছেন।

মায়া রায়ের স্বামী গোপেন রায় একজন দক্ষ শিল্পী। শিল্পী দম্পতি মিলে সংসারটিকে খুবই রমণীয় করে তুলেছেন। ছেলেমেয়েদেরও নাকি ছবি আঁকায় খুব ভাল হাত, শ্রীমতী রায় জানালেন, তবে ওসব করতে দিতে ভরসা হয় না, কারণ এখন তো তাদের পড়ার সময়।

অতসী বড়ুয়া

ইংল্যাণ্ডে এককালে কুমারী মেয়েরা ছবি আঁকতেন। গান গাওয়া, নাচ জানা এবং বিশেষ করে ছবি আঁকা ছিল সুলক্ষণা পাত্রীর অন্যতম লক্ষণ। 'Pride and Prejudice' বইয়ের পাতায় জেন অষ্টেন বলেছিলেন—"A woman must have a thorough knowledge of music, singing, dancing, modern language, and specially drawing to deserve the word accomplished."

আমাদের দেশে পূর্বে বিয়ের বাজারে ছবি আঁকিয়ে মেয়েদের গুণবতী বলে বিশেষ কোন সম্মান দেওয়ার কথা দূরে থাক, ছবি আঁকার সে রকম কোন প্রচলনই ছিল না সমাজের মধ্যে। কোন কলেজ বা ঐ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের কথা তখন কল্পনারও বাইরে ছিল। কিন্তু এখন শিক্ষা ও সংস্কৃতির সব ক্ষেত্রেই পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন মেয়েরা। রান্নাবান্না, ঘর-গেরস্থালীর কাজ ছাড়াও চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকর্মেও তাঁরা পুরুষদের সমকক্ষ হবার চেষ্টা করছেন। যদিও সেটা এখনও সময় সাপেক্ষ তবে শিল্পের দরবারে এঁদের আসন যে এখন অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শিল্পজগতে আজ এই শিল্পীরা এমন সব জিনিষ পরিবেশন করছেন যা তাঁদের স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ। তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল মন নিয়ে তাঁরা অত্যন্ত ধীর ও বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে চলেছেন।

সেই সব মহিলা শিল্পীর মধ্যে থেকে এমন একজন শিল্পীর

পরিচয় দেব, যিনি কোনদিন চারু ও কলাশিল্প সম্বন্ধে কোন স্কুল বা কলেজের শিক্ষা না নিয়েই প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন এবং বহু নামকরা গুণীজনের সাধুবাদে ভূষিত হয়েও কোনও দলমত বা গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি, বরং সকলের মধ্যে থেকেও আপন স্বকীয়তা বজায় রেখে চলেছেন। তিনি হচ্ছেন অতসী বড়ুয়া।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিকায় ছবি আঁকার দিকেই তিনি বিশেষ পক্ষপাতী সব সময়েই তাঁর শিল্পরচনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় আত্মা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করে চলেছেন তিনি। কোনখানে এর বিকৃতি নেই বা আড়ষ্টতা নেই। মরিস পেন্টিং, ফ্রেসকো পেন্টিং বা পিকাসোর ছবির সম্বন্ধে তাঁর কোন বিশেষ ধারণা নেই, দ্বিধাহীন চিত্তেই শ্রীমতী বড়ুয়া তা স্বীকার করলেন। তাঁর মতে, যে ফুল নিজের সৌরভে মাতোয়ারা সে কি ভিন্ন সৌরভে লোভাতুর? তেমনি ভারতের বুকেই যে শিল্প সম্পদ লুকানো রয়েছে, তাকেই আমাদের নতুন করে খুঁজে বার করতে হবে। রঙে, রেখায় বিন্যাসে তাকে চিত্রিত করে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে।

অতসী বড়ুয়া প্রখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদারের কন্যা। মার নাম সরোজবাসিনী হালদার। ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সে সময়ে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যক্ষ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঐ কন্যার নামকরণ করেন 'অতসী'। কবির আশীর্বাদধন্যা যে মেয়ে, সে যে বড় হয়ে উন্নতি করবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। শান্তিনিকেতনে যে সব পণ্ডিত ব্যক্তি জমায়েত হতেন কবিগুরুকে ঘিরে তাঁদের সঙ্গেই তাঁর বাল্যকাল কাটে। যখন তাঁর তিন বছর বয়স তখন তাঁর পিতা প্রথমে জয়পুরে মহারাজা আর্ট স্কুল এবং পরে লক্ষ্ণৌতে সরকারী চারু ও কলা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ নিয়ে চলে আসেন এবং তিনিও পিতার সঙ্গে ঘুরতে থাকেন। লক্ষ্ণৌতে La Martinere College-এ ছাত্রী

জীবন অতিবাহিত করার পর ছবি আঁকার দিকে তিনি মনোযোগ দেন। অতি শৈশবে মাতৃহারা হওয়ার ফলে তিনি এতদিন যে একাকীত্ব বোধ করছিলেন এবার পুরোপুরিভাবে ছবি আঁকার দিকে মনোনিবেশ করে নির্জনতাকে ঢেকে রাখলেন। শিল্পের প্রতি সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবেই তিনি তাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং ধীরে ধীরে তিনি তাঁর সেই শিল্প প্রতিভাকে বিকশিত করেছিলেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পিতার কাছ থেকে মাঝে মাঝে ছবির বিভিন্ন আঙ্গিকের সম্বন্ধে শিক্ষা নেওয়া ছাড়া জীবনে অপর কারো কাছ হতেই তিনি কোন রকম শিক্ষাই গ্রহণ করেননি। চিত্রশিল্পে পূর্ণাঙ্গতা বা স্বীকৃতি পাবার আগেই তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু বেশী আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে সংসারে আর পাঁচটা কাজের মাঝেও তাঁর তুলি ও রঙের খেলা চলতে থাকে। যার ফলে একাডেমী হাউসের একাদশ বার্ষিক প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্র Birth of Lord Buddha বিশেষ সম্মান পায় এবং তিনি একাডেমী থেকে আর্থিক পুরস্কার লাভ করেন। ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে তাঁর চিত্রশিল্প বম্বে, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, সিংহল, তেহারাণ, কায়রো, ব্যঙ্কক এবং জাপানে প্রদর্শিত হয় এবং তিনি সেসব চিত্রের জন্য প্রচুর সম্মান অর্জন করেন।

১৯৫০ সালে তিনি তাঁর স্বামী ডক্টর অরবিন্দ বড়ুয়ার সঙ্গে সিংহলে অনুষ্ঠিত 'World Fellowship of Buddhists' উৎসবে যোগ দেন। সেখানে বসে বসেই তিনি বহু বিখ্যাত লোকের মুখ ও দেহের আকৃতি পেন্সিল রেখায় অঙ্কিত করে বাঙ্গালী নারীর মুখ উজ্জ্বল করেন। ১৯৫৮ সালে পুনরায় তাঁর একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার আর্টিষ্ট্রী হাউসে। এরপর বারখানি চিত্রের মাধ্যমে বুদ্ধের জীবন কাহিনীকে রূপায়িত করার জন্য মহাবোধি সোসাইটি তাঁর কাছে অনুরোধ করেন এবং তিনিও তা পালন করেন।

জৈন দিগম্বর মন্দিরের কর্ণধারগণ শ্রীমতী বড়ুয়াকে ভগবান পরেশনাথের জীবনী ও ঘটনাবলী চিত্রের মাধ্যমে রূপ দেবার জন্য

অনুরোধ করলে, শিল্পী বহু পুরাতন নথিপত্র অনুধাবন করে এবং বহু পরিশ্রমে তা সাধারণের সামনে তুলে ধরে অজস্র প্রশংসা অর্জন করেন। চিত্রগুলি কলকাতার বেলগাছিয়াতে জৈন মন্দিরের পাথরের দেয়ালের গায়ে মুদ্রিত আছে। শ্রীমতী বড়ুয়া একাডেমী অফ্ ফাইন আর্টসের সভ্যা।

চিত্রাঙ্কনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা সম্পর্কে শ্রীমতী অতসী বড়ুয়া বললেন,—ওয়াটার কলারে-এ ছবি আঁকতে আমি ভালবাসি কারণ তাতে ছবির বিষয়বস্তুকে ভালভাবে ফোটান যায়। স্কেচ করতে আমার খুবই ভাল লাগে। যেখানেই গেছি না কেন সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে এঁকে তাদের উপহার দিয়েছি।

শিল্পী বললেন, আর্টের সঙ্গে সুন্দরের সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে এবং শিল্পী সুন্দরের উপাসক। তবে তার মানে এই নয়, ভয়ঙ্কর কোন ছবি শিল্পীরা আঁকবেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন, পরেশনাথের যে ছবি এঁকেছি তা দেখে আমার ছেলে মেয়েরা খুব আনন্দ পেয়েছে এবং ঐ সংক্রান্ত নরকের যে ভয়ঙ্কর ছবিটি আমাকে আঁকতে হয়েছে তা দেখে তারাই আবার আঁৎকে উঠেছে। তখন বুঝলাম ছবিটি আমার সার্থক হয়েছে অর্থাৎ যা বোঝাতে চেয়েছিলাম তাতে সক্ষম হয়েছি। ছবি আঁকার জন্য বিশেষ কোন পরিবেশের প্রয়োজন আছে বলে শিল্পী মনে করেন না তবে এর জন্য 'মুড'কে তিনি অনেকখানি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। চিত্রাঙ্কনে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের অনগ্রসরতার কারণ, শিশুকাল থেকেই আমরা তাদের প্রতি সে রকম মনোযোগ দিই না। এ সম্বন্ধে প্রত্যেক অভিভাবকেই সচেতন হতে হবে বলে আমি মনে করি।

চিত্রাঙ্কন ছাড়াও অতসী বড়ুয়া তাঁর স্বামী পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে আর পাঁচ জনের মতই পুরো সংসারী।

গৌরী দত্ত

ভারতের সুমহান ঐতিহ্যকে সৃষ্টির সামনে মেলে ধরে বর্তমানে যে কয়জন শিল্পী তাঁদের শিল্প সাধনার পথে এগিয়ে চলেছেন, গৌরী দত্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের আর্টকে অনেক সময় দুর্বোধ্য বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ইউরোপ যে এশিয়ারই সংস্পর্শে জেগেছে অর্থাৎ সত্ত বিকাশের মহিমা খুঁজে পেয়েছে তা অনস্বীকার্য। অধ্যাপক ফুমে অজন্তার অপূর্ব কলারাশিকে উপলব্ধি করার জন্য যতটা পরিশ্রম করেছেন রসাস্বাদ তার সামান্য কণাও করেছেন কিনা সন্দেহ। আসলে, দেশের মাটির সঙ্গে শিল্পীর অন্তরের যোগ না থাকলে যথার্থ শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় না। শ্রীমতী দত্ত ভারত-আত্মার সেই মূল সুরটি তাঁর গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে অনুধাবন করতে যে সচেষ্ট তা সত্যই প্রশংসনীয়। তাই তাঁর চিত্রের মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীর রূপ দেখতে পাই। তাঁর ছবির মধ্যে যেমন নব্যতন্ত্রের কোন লক্ষণ নেই, তেমনি সেকালের আর্টকে একালের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেবারও কোন চেষ্টা তিনি করেন নি। শ্রীমতী দত্তের কাজের মধ্যে রেখা ও রঙের প্রয়োগে সুন্দর একটা ললিত ছন্দের বিন্যাস পাওয়া যায়।

শ্রীমতী দত্তের আদি নিবাস যদিও কুমিল্লায় এবং জন্মও সেখানে তথাপি ১৯৪২ সালে কার্যোপলক্ষে তাঁর পিতাকে সদলবলে কলকাতায় চলে আসতে হয়। পিতামাতার তিনি কনিষ্ঠ সন্তান। কমলা গার্লস স্কুল

থেকে তিনি ১৯৫০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী প্রণতি দে ও তাঁর স্বামী কবি বিষ্ণু দে তাঁকে প্রচুরভাবে উৎসাহিত করেন, কারণ চিত্রাঙ্কনে তাঁর হাত সেই বয়সেই তাঁদের বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। অবশ্য বাড়ীতে তাঁর দাদা ও মা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিলেন। শ্রীমতী দত্তের মা কোন স্কুল-কলেজে পাঠ গ্রহণ না করলেও আলপনা আঁকায় তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাই সকলের উৎসাহে তিনি ১৯৫০ সালে সরকারী চারু ও কলা মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন এবং ১৯৫৫ সালে সেখান থেকে ডিপ্লোমা সহ পাশ করে বেরিয়ে এলেন এবং ৫৭ সালে Teachership Diploma Course-ও শেষ করলেন। বলা বাহুল্য ছাত্রী হিসাবে তিনি যথেষ্টই সুনামের অধিকারী ছিলেন এবং গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি স্কলারশিপ পেয়েছেন এবং শেষ পরীক্ষাতেও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন। ছাত্রী হিসাবে সকলের পক্ষেই এটা যে গর্বের বস্তু তা নিঃসন্দেহে সত্য।

শ্রীমতী দত্তের বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় চিত্রকলা। শুধু কলেজ জীবনেই নয়, পরবর্তী জীবনেও তিনি বহু প্রতিষ্ঠান থেকেই পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক যুব কংগ্রেস আয়োজিত উৎসবে তাঁর ছবি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তিনি পুরস্কৃত হন। ১৯৫৫ সালে অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ এক্সিবিশনে তাঁর ছবি প্রথম স্থান লাভ করে এবং তিনি রৌপ্যপদক লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে ঐ একই জায়গায় তাঁর ছবির পুনঃ প্রদর্শনী হয় এবং তিনি তাঁর ছবির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। ঐ বছরেই কলেজ থেকে ওরিয়েণ্টাল আর্টে অঙ্কিত একখানি চিত্রের জন্য তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। পরবর্তী বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'উমার তপস্যা' ছবিখানির জন্য তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। চিত্রাঙ্কণ ছাড়াও মাটির এবং চামড়ার কাজেও তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

'কী ধরণের ছবি আঁকতে আপনি ভালবাসেন।' আমার এ-

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী দত্ত বললেন, জল রঙ ওয়াশ এবং টেম্পেরা পদ্ধতিতে ছবি আঁকতেই আমি ভালবাসি এবং ছবির বিষয় বস্তু হিসাবে ল্যাণ্ডস্কেপ এবং ঐতিহাসিক চিত্র আঁকতেই আমি পছন্দ করি। সেই হিসাবে শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, গোপাল ঘোষ প্রভৃতি শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রগুলি আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে।'

শ্রীমতী দত্ত বললেন, যুগোপযোগী ছবি আঁকা শিল্পীদের উচিত, কিন্তু আমি তা করে থাকি না, কারণ আমি মনে করি তার জন্য আরো বড় বড় শিল্পী আছেন। আমরা সে কাজ কতটুকু পারব ? আর সত্যি কথা বলতে কি, ও নিয়ে আমি কোনদিন চেষ্টা করিনি।'

'শিল্পীরা সুন্দরের পূজারী এবং আর্টের সঙ্গে সুন্দরের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে' গৌরী দত্ত বললেন, মানুষ মাত্রই তো সুন্দর জিনিষটাকে ভালবাসে। শিল্পীরা বরং আরো বেশী করে ভালবাসবে, কারণ তাদের দৃষ্টি আরো গভীর। তাই তারা শুধু সুন্দরের পূজারীই হয় না, তারা তাকে নিয়ে বিশ্লেষণ করে থাকে।'

তিনি আরো জানালেন, 'আবেগের বশবর্ত্তী হয়েই আমি আঁকি, কারণ তা না হলে রঙ কিংবা তুলি নিয়ে যতই বসি না কেন কিছুতেই হবে না আর তার জন্য খানিকটা নির্জ্জন পরিবেশই আমার কাম্য কারণ সব কিছুর পিছনে মনের একাগ্রতা একান্ত প্রয়োজন।'

শ্রীমতী দত্ত বর্তমানে বিবাহিতা।

সুচন্দ্রা রায়

শিল্প কী এবং শিল্পের সার্থকতা কিসে, এ সম্বন্ধে সেদিন এক দীর্ঘ আলোচনা হচ্ছিল শিল্পী সুচন্দ্রা রায়ের সঙ্গে। তিনি প্রথমেই দার্শনিক শেলিভের তত্ত্বের কথা উল্লেখ করে বললেন, বিজ্ঞান ও তত্ত্বের ভিতর দিয়ে যে সত্যকে পাওয়া যায় না শিল্পের ভেতর দিয়ে তা পাওয়া যায়। এবং সার্থক শিল্পী হতে গেলে শুধু বস্তুর বহিরাকৃতিকে হুবহু অনুসরণ করলেই চলবে না, সেই বস্তুর বিশেষ ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কারণ সব প্রকাশেই রসের সৃষ্টি এবং রূপের অনুভূতি জাগে এবং তবেই সেই ভাব নানা ভঙ্গিতে ধরা পড়ে।

সুচন্দ্রা রায় সেই হিসেবে যে সার্থক তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলি সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ল্যাণ্ডস্কেপ ও পোর্ট্রেট বা ফিগারেটিভ কাজের দিকেই তাঁর বেশী আগ্রহ। তাঁর চিত্রে যে মুড বা ভাবাবেশের সৃষ্টি হয়, তা একান্তই দেশী। প্রাচ্যের রীতি বা ধরণ-ধারণে তাঁর পরিষ্কার হাত। ল্যাণ্ডস্কেপে তাঁর রীতি বর্ণনাত্মক কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই সে বর্ণনা একটা বিশেষ মুডকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তাঁর হাতের সাবলীল টানটোন, রঙের পরিমিত ব্যবহার ও ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনে যে বিচক্ষণতার প্রমাণ পাওয়া

গেছে, তা প্রত্যেক চিত্ররসজ্ঞ ব্যক্তি স্বীকার করেছেন। গ্রামের মাঠ, গঙ্গার ধারের মন্দির, তাল নারিকেলের সারি, কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ের বুক, সন্ধ্যাবেলার গ্রাম ইত্যাদি তাঁর চিত্রের মধ্যে যেমন এক সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি পোর্ট্রেট অঙ্কনেও তাঁর অসংযমী মনের হদিস মেলে না। প্রকৃতির রূপ যাতে যথাযথভাবে চিত্রে ধরে রাখা যায়, তারি জন্য বাঙ্গলার গ্রাম থেকে শুরু করে উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্র তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। বিভিন্ন ধরণের মানুষের সান্নিধ্যে এসে তাদের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, শিল্পকলা ইত্যাদি জানবার সুযোগ লাভ করেছেন। পাশ্চাত্যের রীতিনীতি তাঁর ছবিতে প্রতিফলিত হয়নি। তাঁর মতে ভারতীয় ভাবধারাতেই ছবি যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ের হতে পারে।

সুচন্দ্রা রায় সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ ও কন্যা। ১৯৩৭ সালে লরেটো হাউস থেকে তিনি সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করলেন। ছোটবেলা থেকে চিত্রাঙ্কনের প্রতি গভীর মনোযোগ দেখা দেওয়ায় তাঁকে জে, পি. গাঙ্গুলীর কাছে শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে অবশ্য মাখন দত্তগুপ্তের কাছেও চিত্রশিল্পের বিশদ জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯৩৯ সালে একাডেমি অব্ ফাইন আর্টসে তাঁর প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়। এর পর অসুস্থতার জন্য তিনি বহুদিন ছবি আঁকেননি। ১৯৫১ সালে পুনরায় তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয় এবং ১৯৬১ সাল পর্যন্ত একনাগাড়ে একাডেমি হাউসের, বার্ষিক প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি স্থান পেতে থাকে। ঐ বছরেরই ডিসেম্বর মাসে আর্টিষ্ট্রী হাউসে তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৮ সালে Women's Exhibition-এ তাঁর ছবি সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় Governor's Gold Medal লাভ করেন এবং কলিকাতা আর্ট সোসাইটির সর্বশ্রেষ্ঠ আর্থিক পুরস্কার ২৫০ টাকা লাভ করেন। ডিফেন্স ফাণ্ডের জন্য একাডেমি অব্ ফাইন আর্টসের উদ্যোগে শিশুদের যে চিত্র প্রদর্শনী হয়, শ্রীমতী রায় সম্পূর্ণরূপে তার তত্ত্বাবধায়ক

ছিলেন এবং ২,৪০০ টাকা সংগ্রহ করে প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করেন। একাডেমি হাউসে আজ যে চিলড্রেন ষ্টুডিও দেখা যায়, তার প্রতিষ্ঠাতাও শ্রীমতী রায় নিজেই। বহু উৎসাহী ছেলেমেয়েকে তিনি বাড়িতে বিনা পয়সায় শিক্ষা দিয়েছেন। এ ছাড়া জাপানী, ইংরেজ ও রাশিয়ান মহিলারাও তাঁর কাছে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করে গেছেন।

বর্তমানে শ্রীমতী রায় এক নতুন জিনিসে হাত লাগিয়েছেন। তা হচ্ছে "স্টিল লাইফ অন ক্লথ"-এর। ভেতর যে বেশ খানিকটা অভিনবত্ব আছে, তা রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্ট পচ্ছন্দ করেন না। Figurative কাজ করতে তিনি বেশী ভালবাসেন। প্রয়োজন হলে মডেল নিয়ে লাইফ ষ্টাডি করে থাকেন। তেল রঙ এবং প্যাষ্টেলের ছবি আঁকতে তিনি আনন্দ পান। বাস্তবের নিছক অনুকৃতিকরণই যেমন প্রকৃত শিল্পের পরিচয় নয়, তেমনি বাস্তবকে বাদ দিয়েও শিল্পের কথা চিন্তা করা যায় না বলে তিনি মনে করেন। আর্টের সঙ্গে সুন্দরের কোন সম্বন্ধ আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "নিশ্চয় আছে এবং শিল্পীও সুন্দরের উপাসক। কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা সঙ্গীতের মত আর্টও যেদিন ঘরে ঘরে সমাদৃত হবে, সেদিন এই শিল্পকে শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে আমরা প্রত্যেকে অনুভব করতে পারব। এর জন্য সরকারকেও যেমন খানিকটা এগিয়ে আসতে হবে, তেমনি শিল্পীদেরও কর্তব্য হবে জনসাধারণের আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা।"

ছবি আঁকা ছাড়াও সুচন্দ্রা রায় আরো কয়েকটি বিশেষ গুণের অধিকারিণী। তিনি একজন সুগায়িকা এবং সেতার, পিয়ানো প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রেও পটু। ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত জাতীয় সঙ্গীত, কীর্তন ও খেয়াল গান গাইতেন। নামজাদা সঙ্গীতজ্ঞদের কাছ থেকে তিনি এই বিষয়ে তালিম নিয়েছেন। সারা বাংলা সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছেন। কংগ্রেসের

এ-আই-সি-সি অধিবেশনে বহুবার বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি গেয়েছেন। এছাড়া জীবনে যে মহাপুরুষদের সঙ্গে কোন না কোন বিষয়ে নিকট সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা হচ্ছেন,---দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, সরলা দেবী চৌধুরাণী, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার আশুতোষ মুখার্জী, চিত্তরঞ্জন দাশ, হরেন মুখার্জী ও বাসন্তী দেবী প্রভৃতি।

আরতি দাস

বর্তমানে চিত্রশিল্পের ডামাডোলের বাজারে যে সকল মহিলা এখনও তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছেন আরতি দাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। যদিও শ্রীমতী দাস ভারতীয় কলাবিভাগের ছাত্রী তবু শিল্পের দরবারে স্বকীয়তারই যে মূল্য আছে, কোনও পুনরাবৃত্তির মূল্য যে সেখানে নেই, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ। তাঁর আঁকার ধরণ প্রাচ্য মতে হলেও ব্যক্তিগত কল্পনা ও অনুভূতিরও চিত্ররূপ দেবার চেষ্টা ইনি করেছেন। নৈসর্গিক দৃশ্য রচনায় শিল্পী যেমন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্রতেও শিল্পীর সমান সহজ গতি। তাঁর ষ্টাডিগুলিও চমৎকার। শিল্পীর মন যে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ তা তাঁর রচনা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। বিষয়বস্তুর নির্বাচন, বিন্যাস ও রঙের প্রয়োগের গুণে তাঁর রচনাগুলি জনসাধারণের প্রশংসার দাবী রাখে। নক্সার কাজেও শিল্পী সমান দক্ষ। চোখে পড়া মাত্রই দৃষ্টিতে একটি বৈশিষ্ট্যের চমক ধরিয়ে দেয়। ছোটদের জন্য রচিত কয়েকখানি পুস্তকের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণের কাজও তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন।

শ্রীমতী দাস ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া তাঁর সেখানেই চলতে থাকে। কিন্তু বঙ্গ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে তাঁদের সকলকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। ঐ বছরেই তিনি প্রাইভেটে

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সিটি কলেজে প্রবেশ করেন কলা বিভাগের ছাত্রী হয়ে। কিন্তু কোন কারণবশত ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার কিছু আগে তাঁকে পড়াশুনার উপর ছেদ টানতে হয়। বাল্যকাল থেকেই শিল্পের প্রতি অনুরাগ থাকায় ও দাদার উৎসাহে ১৯৫১ সালে সরকারী চারু ও কলা মহাবিদ্যালয়ে তিনি ভর্তি হলেন এবং ১৯৫৬ সালে সেখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে এসে ঐ বৎসরই আর্ট এ্যাপ্রেসিয়েশান কোর্স শেষ করলেন। এরপর আশুতোষ মিউজিয়ামে কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট হিসেবে কয়েক মাস কাজ করার পর আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রীতে যোগ দেন। এই সময়েই অজিত মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে চিত্র সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক অলঙ্করণে তিনি সহায়তা করেন। এরপর তিনি যান দিল্লীতে এবং সেখানে দিল্লী ক্লথ মিলস-এ আর্ট ডিজাইনার হিসাবে চাকুরীতে নিযুক্ত হন। সেখানে তিন বৎসর সুনামের সঙ্গে কাজ করার পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন। শ্রীমতী দাস তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আর্ট কলেজ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বোর্ড, ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার লাভ করেছেন।

চিত্রাঙ্কনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত হ'ল, "আমরা যে যুগে বা যে সমাজে বাস করছি তার প্রভাব শিল্পীদের শিল্পকলায় সব সময়ে ফুটে উঠবে, এমন ধরাবাঁধা নিয়ম থাকা উচিত বলে তো মনে হয় না ; কারণ শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দৃশ্যবস্তুর বাইরেও এমন অনেক জিনিস আছে যা শিল্পী তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেন বা উপলব্ধি করেন এবং তাই তিনি তাঁর রঙ ও তুলিতে রূপ দিয়ে যান।"

শ্রীমতী দাস আমার অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, "মানুষ মাত্রেই সুন্দরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। সৃষ্টিতেই শিল্পীর আনন্দ। তার সৌন্দর্যবোধ সাধারণ দৃষ্টিকে অতিক্রম করে এমন স্থানে পৌছায় যেখানে চোখের ও মনের দৃষ্টি এক হয়ে এক অনন্যসাধারণ

অনুভূতিতে পরিণত হয়। তার এই অনুভূতির পরিস্ফুটন বা শিল্প সৃষ্টিই হল তার সাধনার সার্থকতা। যে রূপ অসুন্দর বা কুৎসিত তাকেও শিল্পী তার সৃষ্টির মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তিক্ত অনুভূতির অভিজ্ঞতায়। কাজেই সুন্দর ও অসুন্দর দুটোকে বিভিন্ন অনুভূতি ও নৈপুণ্য দিয়ে তুলে ধরাই হচ্ছে শিল্পীর সাধনা বা উপাসনা।

আর একটা কথা ভারতীয় প্রথায় আমি ছবি এঁকে থাকি কারণ ভারতীয় পদ্ধতি আমার ভাল লাগে। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য—যখন যেটা ভাল লাগে তখন সেটা করি। দুটোর সমন্বয় ঘটিয়ে যদি ভাববস্তু সুন্দরভাবে সৃষ্ট হয় তাতেও আমার আপত্তি নেই। আসলে সৃষ্টির আদর্শ বা রীতি-নীতি সবটাই আমার মুড বা মনে ভাল লাগার উপর নির্ভর করে। পাশ্চাত্যের শিল্প সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যে খুব বেশী নেই তা বলতে দ্বিধা নেই। তবে আমার মনে হয় বিদেশ থেকে প্রথা-প্রকরণ জোগাড় করা ভাল, তবে পুরোপুরি বিদেশী ছাঁচে ছবি তৈরি না করে ভারতীয় বিষয়বস্তুর উপর ছবি তৈরি করা উচিত।"

তাঁর মতে, "শিল্পীদের নির্জনতা একটু প্রয়োজন তা না হলে একাগ্রতা কমে যায়।" শ্রীমতী দাস বললেন, "আর আবেগ না এলে ছবি কিছুতেই সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না।"

আমার অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার দরুণই চিত্রশিল্প আজ এতো পিছিয়ে আছে। যেখানে এত অভাব অনটন সেখানে মানুষ চায় সঙ্গে সঙ্গে কিছু পেতে। সত্যিকারের শিল্পী সেখানে গড়ে উঠবে কেমন করে?

রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রাচীন ইতিহাস থেকে আমি ছবির উপাদান সংগ্রহ করে থাকি এবং ল্যাণ্ডস্কেপও করে থাকি। জলরঙে সাধারণত ছবি এঁকে থাকি। তা ছাড়া উডকাট, লিনোকাট, ড্রাইপয়েন্ট, এচিং, প্যাস্টেল—এ সবের মাধ্যমও ব্যবহার করে থাকি।"

শ্রীমতী দাস ১৯৬১ সালে সুভাষচন্দ্র দাসের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

অমিতা ঘোষাল

সৃষ্টির দিক হতে শিল্পী হচ্ছে মানসপুত্রের জন্মদাতা, সেখানে অজ্ঞাতভাবে সে বিশ্বধাতার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত। বরভূধর, সারনাথ, সাচী, অমরাবতীর শিল্পেও তাই দেখতে পাই যেন সেই অজ্ঞাত হাতের ছাপ, যেন শিল্পীর জীবন ললিতশিল্পের তালে অনুধৃত। বলাকার মত সেকালের শিল্পীরা চিত্তাকাশে দলে দলে ডানা মেলেছেন। প্রণালী সহজ ও স্বাভাবিক না হলে তা সম্ভব হোত না। এরা কেউ যন্ত্রের মত কাজ করে যায়নি। শিল্পীরা সমগ্র কল্পনার ভিতরে নিজের আত্মীয়তা অনুভব করেছে। অবনীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'শিল্পীর শিল্পের রচনার বৈশিষ্ট্য তাহার ব্যক্তিগত মতামত বা ধ্যান-ধারণার মধ্যে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না। এই বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী বা প্রকাশ প্রণালীর উপর। এই শিল্প সৃষ্টির আবেদন যাঁর যত বেশী শিল্পী হিসেবে তিনি তত সার্থক।' শ্রীমতী ঘোষাল শিল্পী হিসেবে বিরাট খ্যাতির অধিকারী না হলেও তিনি দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্যকে আপন ছবির মধ্যে অনুপম শিল্প মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রূপে রসে রঙে যার মধ্যে পাওয়া যায় ভারতের একান্ত নিজস্ব অভিব্যক্তি। তাঁর পৌরাণিক চরিত্র বা আখ্যানবস্তু এবং কল্পনাপ্রসূত বিষয় অবলম্বনে আঁকা ছবিতেও প্রাচ্যের শিল্পভঙ্গী হতে প্রতিভাত দেখা যায়। বিশেষ মুহূর্তে মনের বিশেষ ভাবকে চোখে মুখে মূর্ত করে তোলায় তাঁর হাত খুবই প্রশংসনীয়। শুধু তাই নয়, রঙের নির্বাচন ও প্রয়োগেও একটা মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করার কৃতিত্বের জন্য অমিতা ঘোষালের রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া গঙ্গার মাটি ও পিজবোর্ডে তৈরী ক্যানভাসের উপর তাঁর রচনা অপূর্ব। শিল্পী যে অত্যন্ত চিন্তাশীল ও

ভাবপ্রবণ, তার প্রমাণ তাঁর ছবিতে। শুধু চিত্রাঙ্কন নয়, কারুশিল্পেও তিনি বিশেষ গুণের অধিকারিণী। সাধারণের অব্যবহৃত বা ফেলে দেওয়া টুকিটাকি থেকে তিনি যেমন কারুশিল্পের সৃষ্টি করেছেন, যা অনুবীক্ষণ করলে সকলকে মুগ্ধ হতে হবে। কাদামাটির কাজ, চামড়ার কাজ, লেস বোনা, পাখীর পালক দিয়ে তৈরী পুতুল, পশমের পুতুল, নারকেলমালা ও ঝিনুকের পুতুল প্রভৃতি কারুশিল্পগুলি সত্যই মনোরম।

অমিতা ঘোষাল ১৯১৯ সালে মামার বাড়ী নৈহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। মা ইন্দুমতী দেবী সুলেখিকা ও রূপে-গুণে অতুলনীয়া বলে তৎকালীন নারীসমাজে বিশেষ খ্যাতি ছিল। প্রখ্যাত শিল্পী চিত্তপ্রসাদ তাঁর বড় ভাই। শিশুকাল হতেই তিনি এমন এক পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন, যেখানে অর্থের প্রাচুর্যের সঙ্গে ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির অপূর্ব সংযোগ। বহু প্রখ্যাত ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। তাই কোন স্কুল-কলেজের তথাকথিত ছাপ অর্জন না করলেও গৃহে তিনি এমনই শিক্ষা পেয়েছিলেন, যা পরবর্তী জীবনে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

তিনি প্রখ্যাত শিল্পী বসন্ত গাঙ্গুলীর কাছে অয়েলের কাজ শিখেছেন। জার্ম্মাণ শিল্পী Mr. Wermann-এর কাছে শিখেছেন স্কেচ করা। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় নেতাজী ভবনে সুভাষচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে। সরকারী চারু ও কলা মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি বহুবার প্রদর্শিত হয়েছে। ১৯৫৮ সালে তাঁর ছবির পুনরায় একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সময় তিনি তাঁর শিল্পকীর্তির শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন স্বরূপ রাজ্যপালের স্বর্ণপদক লাভ করেন। এখানে বলা প্রয়োজন, শিল্পী হিসাবে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত হলেও ছবি আঁকা তাঁর কোন দিনই পেশা নয়। গৃহকর্মের ফাঁকে ফাঁকে চলে তাঁর শিল্পচর্চা। তেলরঙ, জলরঙ, প্যাস্টেল, উডকাট, লিনোকাট, প্রায় সব রকম

কাজই তিনি করে থাকেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, আমরা যে যুগে বা যে সমাজে বাস করছি, তার ছাপ শিল্পীদের শিল্পকলায় সব সময় ফুটে উঠবে এমন কোন কথা নেই। কারণ শিল্পীরা যেমন যুগের দিকে তাকিয়ে ছবি আঁকবে, তেমনি অতীত ও বর্তমানের প্রতিও দৃষ্টি রাখা তাদের অবশ্য কর্তব্য। আমার অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, আমি প্রাচ্যমতে ছবি করলেও মনে করি পাশ্চাত্যের ভাল যে দিক, তা অনুসরণ করলে ফল ভালই হবে। কারণ ও সব দেশ আমাদেও চেয়ে এখনো অনেক এডভান্সড্।

"রঙ হিসেবে আকাশী রঙটাই আমার সবচেয়ে প্রিয়। কারণ আকাশই সব রঙকে ধরে রাখে। টাইগার হিলের সৌন্দর্য এত ভাল লাগত না, যদি না আকাশ তাকে ঐভাবে ধরে রাখত। আর্টের সঙ্গে সুন্দরের নিকট সম্বন্ধ আছে। কারণ ও দুটো পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

চিত্রাঙ্কন ছাড়াও শ্রীমতী ঘোষাল তাঁর বাড়ীতে একটি স্কুল পরিচালনা করছেন. যেখানে ছোট ছোট শিশুদের, এমন কি তাঁদের দাদা, দিদি, মায়েদেরও শিল্প, নাচ, গান শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতের সব জায়গাতেই তিনি ঘুরেছেন। সহরের বিত্তবান ব্যক্তিদের যেমন দেখেছেন চোখের কাছে, তেমনি মনের কাছাকাছি গিয়ে মিশেছেন ভারতের গ্রামাঞ্চলে খেটে-খাওয়া মানুষের সঙ্গে। একদিকে যেমন দেখেছেন ব্যভিচার, স্বার্থপরায়ণতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অপরদিকে তেমনি দেখেছেন ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি। আর সেসব সুখদুঃখের স্মৃতি তাই তাঁর শিল্পে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। বললেন, 'সে কাজে কতটা সফল হয়েছি তা আমি জানি না। তবে মনের আবেগকে যে প্রকাশ করতে পেরেছি, তাই আমি যথেষ্ট মনে করি।'

শ্রীমতী ঘোষাল একজন সুলেখিকা ও সুগায়িকাও বটে। ১৯৪৩ সাল হতে ১৯৫০ পর্যন্ত আকাশবাণীর বড় ও ছোটদের বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্যান্য রচনার সঙ্গে বড়দের বিভাগে 'এল মধুমাস' নামে

গীতিনাট্য ও ছোটদের বিভাগে 'শাঁখারী' অভিনীত হয়। সে সময়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র ঢাকা কেন্দ্র হতেও তিনি ১৯৪২ সালে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। বঙ্গ বিভাগের আগে ও পরে গানের রেকর্ডও হয়। এইচ এম, ভিতে স্বরচিত Nursery Record করেন হিন্দী ও বাংলায়। যে সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তিনি সুনাম অর্জন করেন তার মধ্যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, একাডেমি অব্ ফাইন আর্টস ও বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির নাম করা যেতে পারে। উল্লখযোগ্য, বেহালা বিদ্যানগর স্কুলের তিনি ছিলেন সংগঠিকা। বহু মাসিক পত্রিকার তিনি সম্পাদনা করেছেন এবং মাসিক বসুমতী, আনন্দবাজার, দেশ, মহিলা প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কাগজে তিনি লিখেছেন। পিয়ানো, গীটার ও সেতার বাজনাতেও তিনি পারদর্শিনী। শ্রীমতী ঘোষাল সেণ্ট্রাল মডেল স্কুলে আট বৎসর যাবৎ শিক্ষিকা হিসাবেও নিযুক্ত ছিলেন। যাঁদের বিশেষ আন্তরিকতা ও উৎসাহে সংসারের সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে শ্রীমতী ঘোষাল তাঁর শিল্পীসত্বা বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁদের মধ্যে হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কবিশেখর কালিদাস রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী কনকলতা, হাসিরাশি দেবী প্রভৃতি মনীষীগণ উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর শহীদ জীবনলাল ঘোষালের ভাই বিশিষ্ট লৌহ ব্যবসায়ী শ্যামলাল ঘোষালের সহিত নমিতা দেবীর বিবাহ হয়েছে।

কল্যাণী চক্রবর্তী

শিল্পী যা কিছু রচনা করেন তাতে হৃদয়ের অনাছন্ত ইতিহাস অনুবিদ্ধ না হলে রম্যকলার কোন মূল্যই থাকে না। এর পর হচ্ছে রঙ আর রেখা, যার একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির পথও নেই, প্রশংসাও করা চলে না। এ সম্পর্কে রোলাঁ্যা বলে গেছেন, "যত শিল্পী, তত রকমের রেখাঙ্কন, তত রকমের রঙের খেলা।" বিষয়বস্তুকে বাছাই করে নিয়ে যে শিল্পী সত্যকার রূপটিকে যথাযথভাবে জনসমক্ষে হাজির করেন শিল্পী হিসেবে তখনই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তা সে আধুনিক চিত্রকলার পথ ধরেই হোক বা ভারতের অতীত ঐতিহ্যকে সামনে রেখেই হোক। শিল্প যে শুধু বর্তমান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরেই অগ্রসর হবে এমন কথা যেমন কোথাও লেখা নেই, তেমনি অতীতকে আঁকড়ে ধরে বা তারই স্মৃতি মন্থন করে অর্থাৎ উগ্র প্রাচীনপন্থী হয়ে শিল্পীকে তাঁর জীবন কাটাতে হবে, এমনও কোন বাঁধাধরা নিয়ম কোথাও নেই। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় শিল্পী কল্যাণী চক্রবর্তীর মধ্যে। এঁর বেশীর ভাগ রচনা ভাব ও বস্তুজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁর প্রত্যেকটি ছবিতে আছে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের মাধুরী। যেমন শ্রীমতী চক্রবর্তী তাঁর প্রাচীন রাজধানী চিত্রের মধ্যে কল্পনাকেই সবচেয়ে বড় প্রাধান্য দেন নি, বরং তারই মাধ্যমে তিনি স্বকীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর অঙ্কিত বার্থ অব্ বুদ্ধ চিত্রখানি যথাযথ রঙের প্রয়োগের গুণে সার্থক শিল্পে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া 'শ্রীমতী' ও আরো কয়েকখানি চিত্রে অকৃত্রিম প্রেমের ছাপ সুপরিস্ফুট। কাব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের কবিরা যে রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন, যুগ যুগ ধরে শিল্পীর রঙ ও তুলির টানে তার যথার্থতা প্রকাশ পেয়েছে। ছবিগুলি হয়ে উঠেছে যার ফলে প্রাণবন্ত। চিত্রাঙ্কন

ছাড়াও ক্র্যাফটস্-এর কাজেও শিল্পীর গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নক্সা ছাপা অথবা কাপড়ের উপর ব্লক পদ্ধতিতে ছাপার কাজ, যা ভারতে বহুদিন থেকে চলে আসছে, সেগুলিও চমৎকার। বাটিকের কাজ, বা চামড়ার কাজও তিনি করে থাকেন।

কল্যাণী চক্রবর্তী ১৯৩৩ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর পিতা। শিশুকাল থেকেই শিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ দেখা যায়। গুণী পিতার কিন্তু তা চক্ষু এড়িয়ে যায় না। তিনি কন্যাকে তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলির প্রতি মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি দিতে লক্ষ্য করেন। ১৯৪৯ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর রমেনবাবু ১৯৫০ সালে কন্যাকে ভর্তি করিয়ে দেন সরকারী চারু ও কলা মহাবিদ্যালয়ে। ১৯৫৫ সালে কলেজের পাঠ সমাপ্ত হলেও তিনি আরো এক বৎসর বাটিকের কাজ নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। উভয় পরীক্ষাতেই শ্রীমতী চক্রবর্তী প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ ব্যাপারে তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, "আমার পিতার কিন্তু তা দেখা হয়নি।" তার আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন। ১৯৫৭ সালে শ্রীমতী চক্রবর্তী জুনিয়ার বেসিক স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে আর্টিষ্ট্রী হাউসে-এ তাঁর চিত্রের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনি প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন। এরপর আরো দু'এক জায়গায় তাঁর চিত্রের প্রদর্শনী হয়। ১৯৬১ সালে Institute of Education for Women কলেজের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। তাঁর মনের তীব্র বাসনা শিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সময় ও সুযোগ হলে পাশ্চাত্যের দেশগুলি ভ্রমণ করে শিল্প সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা। চিত্রাঙ্কনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত হল—জল ও তেল উভয় রকম রঙই তিনি ব্যবহার করে থাকেন। তবে ছবির প্রকারভেদে ও গুণবিচারে যে রঙ যেথায় প্রযোজ্য তাই যথাযথভাবে প্রয়োগ করার

মধ্যেই শিল্পীর যথার্থ গুণ বিচার হয়। ছবি আঁকার সময় তাই ঐ জিনিসটার প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আমার দ্বিতীয় এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, যে যুগে আমরা বাস করছি, যে সমাজে আমরা বাস করছি, তারই প্রতিচ্ছবি শিল্পীদের শিল্পকলার ফুটে ওঠা উচিত। তবে কোন্ পথে এবং কী ভাবে এগুতে হবে তা অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করা উচিত। বাস্তবের নিছক অনুকৃতিকরণই যেমন প্রকৃত শিল্পের পরিচয় নয়, তেমনি বাস্তবকে পুরোপুরি বর্জন করাটাও সমীচীন নয় বলেই তিনি মনে করেন। আজকাল শিল্পজগতে একদল ভারতীয় ঐতিহ্যমূলক শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করায় যেমন ব্রতী হয়েছেন, অপর দল তেমনি বর্তমান ইয়োরোপীয় শিল্পধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে দুই দেশের শিল্পের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে শিল্পী নিজে কোন্ মতাবলম্বী প্রশ্ন করাতে তিনি বললেন, "পাশ্চাত্য শিল্পধারার সঙ্গে আমি বিশেষ পরিচিত নই। সে সব দেশে এখন Realistic art নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছে, অথচ আমি সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিতে ছবি এঁকে চলেছি। আর্টের সঙ্গে সুন্দরের নিকট সম্বন্ধ আছে ঠিকই এবং শিল্পীরাও সুন্দরের উপাসক; তবে সুন্দরের নিজস্ব কোন ফর্ম না থাকার দরুন সাধারণের পক্ষে অনেক সময় তা বুঝতে অসুবিধা লাগে।"

ছবি আঁকার বিষয়বস্তুর জন্য সমকালীন কোন ঘটনায় প্রভাবিত না হয়ে মনের ভিতর শিল্পীর যখন যা কিছুর উদয় হয় তারই মধ্যে থেকে এবং আমাদের দেশের পৌরাণিক ইতিহাস থেকেই তিনি বিষয়বস্তু নির্বাচন করে থাকেন এবং ছবি শুরু করার পর থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা শেষ হচ্ছে, ততদিন এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাঁকে সময় কাটাতে হয়। ছবি আঁকার পরিবেশ হিসেবে নির্জনতাই কাম্য বলে তিনি মনে করেন।

শ্রীমতী চক্রবর্তী যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান হতে পুরস্কৃত হন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত All India Textile Design Exhibition-এ পুরস্কার লাভ।

All India Handloon Board-এর পরিচালনায় ১৯৫৩-৫৪ সালে অনুষ্ঠিত Paper Design in Textiles Hand-loom Industry প্রতিযোগিতায় এবং পাতিয়ালায় অনুষ্ঠিত All India Industrial Exhibition—এই উভয় জায়গাতেই বিশেষপ্রশংসাপত্র লাভ।

ছাত্র সম্মিলনী কর্তৃক ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত All India Exhibit'on-এ ভারতীয় চিত্রকলার দরুণ প্রথম পুরস্কার স্বরূপ রৌপ্যপদক লাভ। Academy of Fine Arts & Crafts কর্তৃক ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক প্রদর্শনীতে Graphic Art-এ প্রথম পুরস্কার স্বরূপ স্বর্ণপদক।

১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত All India Handicrafts Exhibition-এ বাটিকের কাজ এবং মাটির খেলনা তৈরির কাজের দরুণ প্রথন পুরস্কার লাভ। এ ছাড়া শিল্পীর বিশেষ কৃতিত্ব হচ্ছে যে, মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো প্রদর্শনীতে তাঁর অঙ্কিত একটি ছবির প্রদর্শনী, যা প্রখ্যাত সমালোচকদের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

অত্যন্ত দুঃখের কথা, আজ শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী আমাদের মধ্যে আর নেই। যে পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধকে তিনি এতখানি ভালবেসেছিলেন সেই পৃথিবী থেকেই আজ তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে অতি অল্প বয়সে।

সরমা ভৌমিক

কোন দিন কোন কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণ না করেও শিল্পী হিসেবে প্রচুরপ্রতিষ্ঠা যারা লাভ করেছেন সরমা ভৌমিক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আসলে নিষ্ঠা, সততা, অধ্যাবসায়ই মানুষকে কবি, সাহিত্যিক বা শিল্পী হিসাবে গড়ে তোলে। এঁদের দৃষ্টিও হয় ভিন্ন প্রকৃতির, কোন বস্তুকে প্রয়োজন সিদ্ধির উপকরণহিসাবে তাঁরা দেখেন না। বস্তুটিকে যথার্থরূপে তাঁরা ধরে রাখতে চান। এই শিল্প সৃষ্টি দ্বারা যে সত্যকে পাওয়া যায়, অনুভবের, নিছক জ্ঞানের নয়। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বহির্বাটির রাস্তাঘাট নিয়ম-কানুন সমস্তই যেমন অন্দর মহলের সঙ্গে স্বতন্ত্র, তেমনি বুদ্ধির প্রেরণা আর রসবস্তু বিকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। পশ্চিমের দার্শনিকেরাও বিচার বুদ্ধিকে শিল্পসৃষ্টি বা সৌন্দর্য্য বোধের অবলম্বন মনে করেন না। Intuition বা বোধিকে প্রাধান্য দেন। তাই কলেজীয় বিদ্যায় শিক্ষিত না হয়েও শ্রীমতী ভৌমিক তাঁর শিল্পকলায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামীণ সৌন্দর্যকে বিভিন্ন কোন থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং অনেক বিচার-বিশ্লেষণের পর তথাকার লোকজন, তাদের আচার ব্যবহার, পালপার্ব্বণে তাদের সহজ আনন্দ প্রকাশের ভঙ্গি, অতি নিপুণভাবে তুলি ও রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। যদিও ছবি আঁকার জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন ধারা তিনি গ্রহণ

করেন না, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি পাশ্চাত্যের ছাঁচে ঢালা পথেও তিনি অগ্রসর হননি। বরং সুকৌশলে এড়িয়েই গেছেন। শান্তিনিকেতনের প্রভাব আছে তাঁর কতকগুলি ছবিতে। যদিও শ্রীমতী ভৌমিকের ছবির একক প্রদর্শনী খুব বেশী অনুষ্ঠিত হয়নি, তবুও যে কয়েকবার হয়েছে, তারি মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পী সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমতী ভৌমিক আধুনিকপন্থী নন, তাই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ভাল লাগা না-লাগার ওপর অতিরঞ্জন বা অনুরঞ্জন করে কোন নব্যতন্ত্রের অবতরণা করেননি। তাঁর ছবির মধ্যে যে প্রাণ আছে তা তাঁর চিত্র দেখে স্পষ্ট অনুমিত হয়।

১৯১৭ সালে হাওড়া জেলায় বোরদা গ্রামে সুষমা ভৌমিকের জন্ম। পিতা পঞ্চানন চোঙদার ও মা সুশীলা দেবীর পুত্র-কন্যার মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তাঁর স্কুলের পাঠ গৃহশিক্ষকের কাছেই সম্পূর্ণ হয়। অতি অল্প বয়সে (১৯৩১ সালে) বিবাহ হওয়ার দরুণ তাঁকে পড়াশুনা ত্যাগ করতে হয়, কিন্তু ছোটবেলা হতেই ছবি আঁকার দিকে অসীম আগ্রহ থাকায় তাঁর স্বামী বিজ্ঞানী বিভূতিবিলাস ভৌমিক তাঁকে চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী করে তোলার জন্য গৃহেই চিত্রশিল্পী অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়োগ করেন। তাই শ্রীমতী ভৌমিকের প্রতিষ্ঠা পাবার মূলে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের দান অপরিসীম। এ ছাড়া গোপাল ঘোষ ও রথীন মৈত্রের কাছেও তিনি কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি তাঁকে নানা দিক হতে সহায়তা ও উৎসাহ দিয়েছেন তাঁর স্বামী। শ্রীমতী ভৌমিকের ছবির প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালে। এর আট বছর পর তাঁর ছবির পুনরায় একটি প্রদর্শনী হয়। এ ছাড়া এ্যাকাডেমী হাউসের প্রদর্শনীতে প্রায় প্রতি বৎসরই এঁর ছবি থাকে।

জলরঙ এবং টেম্পেরার মাধ্যমেই শিল্পী বিশেষ করে তাঁর ছবি ফুটিয়ে তুলে থাকেন। সম্প্রতি তিনি তেলরঙে কাজ করছেন। ছবি আঁকার বিষয়বস্তু তিনি গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য থেকেই

খুঁজে বার করে থাকেন। ছবি আঁকার জন্য সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথাই তিনি অনুসরণ করে থাকেন।

আমার অপরাপর প্রশ্নের উত্তরে সরমা দেবী বললেন, শিল্পী নিশ্চয়ই সুন্দরের উপাসক কারণ তার শিল্পের সঙ্গেই সৌন্দর্য কথাটা জড়িয়ে আছে। ছবি আঁকার জন্য খানিকটা নির্জন পরিবেশই তিনি কাম্য বলে মনে করেন এবং মুডই তাঁর হাত ও তুলির মিলন ঘটায়।

শ্রীমতী ভৌমিক একটি মাত্র কন্যার জননী।

সুলেখা চ্যাটার্জী

বাস্তবকে নিয়ে যেখানে অতৃপ্তি সেখানে তারই সঙ্গে আর্ট যোগ করেছে মনের লীলাপ্রসঙ্গ যাতে তা সম্পূর্ণতর ও সঙ্গততর হয়েছে। এজন্য আর্ট বৃহত্তর ও গভীরতম জীবন। নন্দলাল বসু মহাশয় বলেছেন শিল্প হল সৃষ্টি, ছন্দ এবং কল্পনা। রেখা রঙে রূপে রসানুভূতির প্রকাশ। রসের উদ্রেক করাতেই তার সার্থকতা। বিশেষ রূপের বিশেষ ছন্দ বিশ্বব্যাপি প্রানের ছন্দে মিলিত হয় শিল্পীর কাছে। একে দরদ বলে। এই দরদের ফলে শিল্পী যা তার ধ্যানের প্রকাশের বিষয়, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। এবং যথার্থ শিল্পী আখ্যা লাভ করবেন তিনিই, যিনি বস্তুর রূপ সচেতনভাবে দেখেন। অর্থাৎ নিজের সত্তা, নিজের গুণ যিনি জানেন।

কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্যের ছোঁয়া লেগে বহু যুবক-যুবতী তুলিকাটি হাতে নেওয়ার কায়দাটি আয়ত্ত করতে পারলেই দুনিয়ায় কারও আনুগত্য স্বীকার করাটাকে অপমানজনক মনে করেন এবং একটা নূতন আশ্চর্য বা অদ্ভুত কিছু করতে মতলব করেন। অন্য কোন আর্টিস্টের প্রণালীকে তাচ্ছিল্য করেন। তাঁর গোড়াকার খেয়ালই হয়ে দাঁড়ায় ভাল কিছু করা নয়, নতুন কিছু করা। মৌলিকতা মাথা তুলে দাঁড়ায়, সৌন্দর্যও তাঁদের কাছে অনেক সময় তুচ্ছ হয়ে যায়।

উৎসব আনন্দ গীত এ সব যেমন পাঁচজনকে নিয়ে হয়েছে, একের মনস্তুষ্টির জন্য হয়নি, আর্টও তেমনি। একথা আজকালকার অনেক শিল্পী বিস্মৃত হন। আর্টের উৎপত্তি মানুষের সামাজিক অস্তিত্বে; তার কাজও সামাজিক। তাই নিজের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে শিল্পীর অন্তরের যোগ থাকা চাই। শুধু পাশ্চাত্যের কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করে সেজান, পিকাসো বা মাতিস প্রভৃতি শিল্পীদের অনুকরণ করাটাই মহৎ একটা করা নয়। পশ্চিমের বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত বলেছেন···ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ, যার ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলা সম্বন্ধে জগৎ এখনও একেবারে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ (···the most full of riddles of all the arts of the world)। তাই প্রাচ্যের শিল্পকে নেহাৎ ছোট হিসাবে না দেখে তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে চিত্রে স্থান দিলে তাই মহৎ সৃষ্টি বলে প্রতিপন্ন হবে। ভারতের তাজমহল শুধু মাত্র দেখে Havell সাহেব লিখেছিলেন : (It is India's noble tribute to the grace of Indian womanhood, the Venus-de-Milo of the East।)

তবে আমি বলছি না সেকালের আর্টের উপর একালের আর্টকে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। বরং একালের আর্টের ভিত্তি সেকালের আর্টের উপরই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কথাগুলি আমার নয় বরং আমার সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্পী সুলেখা চ্যাটার্জী উপরের কথাগুলি বললেন। শিল্পী যদিও কয়েক বৎসর পূর্বে পাশ্চাত্যের দেশগুলি ভ্রমণ করে দেশে ফিরেছেন, কিন্তু চোখে তার কোন নেশা লাগেনি। বরং প্রাচ্যশিল্পের প্রতি তিনি আরো গভীরভাবে আবিষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর অঙ্কনের ধারাও হয়েছে সেই পথকে অবলম্বন করেই।

সুলেখা চ্যাটার্জী ১৯৩৮ সালে কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতামাতার তিনি সর্বকনিষ্ঠ সন্তান এবং সেজন্যই সবাকার আদরযত্ন বেশীই ছিল তাঁর উপর।

শৈশবকাল হতেই সুলেখার মনে শিল্পী হবার বাসনা জাগে এবং তিনি কাগজ কলম হাতে পেলেই সব কিছু ফেলে রেখে ছবি আঁকতেন। ১৯৫৩ সালে কমলা গার্লস স্কুল থেকে তিনি পাশ করেন আর্ট এ্যাপ্রেশিয়েশন কোর্সে ডিসটিংশন নিয়ে। সে সময়ে তাঁর শিল্প শিক্ষিকা ছিলেন শানু লাহিড়ী। এরপর ১৯৫৩ সালে আর্ট কলেজে ভর্তি হলেন এবং পাশ করে বেরিয়ে এলেন ১৯৫৮ সালে। প্রখ্যাত শিল্পী চিন্তামণি কর সেদিন ছিলেন তাঁদের অধ্যক্ষ। সুলেখা ছিলেন ইণ্ডিয়ান আর্টের ছাত্রী। ১৯৫৯ সালে তিনি আর্টিস্ট্রী হাউসে প্রথম একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ঐ বৎসর তিনি প্রাইভেট ছাত্রী হিসেবে আই-এ পাশ করেন এবং যাদবপুর কলেজে ভর্তি হন। ইংরাজী বিষয়ে ডিসটিংশন নিয়ে পাশ করে বেরিয়ে আসার পর তিনি দিলীপ দাসগুপ্তের স্টুডিওতে তাঁর অধীনে কাজ করতে সুরু করেন। অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের অধীনেও তিনি কাজ করেছেন।

১৯৬০ সালে দিল্লীতে তাঁর ছবির পুনরায় একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। ঐ একই বৎসরে ললিতকলা এ্যাকাডেমির বাৎসরিক প্রদর্শনীতেও তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয় এবং এ্যাকাডেমি তাঁর একখানি ছবি ক্রয় করেন। এবার তাঁর প্রদর্শিত ছবিগুলি প্রত্যেক পত্রপত্রিকার উচ্চপ্রশংসা লাভে ধন্য হয়। একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা তাঁর চিত্রকলার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন : Miss Chatterjee has talent and her drawing is uniformly competent and good। ১৯৬১ সালে যুগোশ্লাভাকিয়া গর্ভর্নমেণ্টের বৃত্তি লাভ করে তিনি সেদেশে যান এবং শিল্পী Nilom-milu Novich-এর অধীনে ফ্রেস্কো এবং মোজাইক শিক্ষা করেন। যুগোশ্লাভিয়া ছাড়াও তিনি ঐ সময় পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরে আপন জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। ১৯৬৩ সালে বেলগ্রেড ইণ্টারন্যাশান্যাল ক্লাব তাঁর ছবির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল এবং স্থানীয় চিত্র সমালোচকরাও তাঁর চিত্রের উচ্চপ্রশংসা না করে পারেনি। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত তিনি বেলগ্রেড ন্যাশন্যাল মিউজিয়ামে

কাজ করেছেন। এরপর শ্রীমতী চ্যাটার্জী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিদেশে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি বললেন, 'ওদেশে অধ্যাপকগণের সঙ্গে অবাধে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি। মন খুলে কাজ করেছি যা এখানে সাধারণত হয় না।'

শ্রীমতী চ্যাটার্জী তেলরঙ, জলরঙ, টেম্পেরা, গ্রাফিক, মোজাইক প্রভৃতি সব রকম কাজই করে থাকেন এবং শিল্পী আনন্দও তাতে প্রচুর পান। ইনি আধুনিকপন্থী নন। তাঁর হাতের টানটোনগুলিও বেশ সাবলীল। কতকগুলি ছবি বিষয়বস্তুর দিক থেকে বৈচিত্রের সঙ্গে ভাবব্যঞ্জক দৃশ্য রচনা ও বর্ণবিন্যাসে সমৃদ্ধ কল্পনাশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। সাদৃশ্য সত্য ধরে কিছুটা প্রথাগত আঙ্গিকে রচনা করলেও রসিক ভাবুক এবং শিল্পী মনের স্পর্শে সত্যই ছবিগুলি পরিপূর্ণ। তাঁর চিত্রগুলি দেখলেই মনে হয় তা যত্ন সহকারে পরিকল্পিত এবং রচিত। বর্ণের নিজস্ব মূল এবং বিশেষত্ব সম্বন্ধে শিল্পী খুবই সজাগ। রেখার বিন্যাসেও মাঝে মাঝে তিনি চমৎকার ছন্দপূর্ণ প্যাটার্ণের সৃষ্টি করেছেন।

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী চ্যাটার্জী বললেন, শিল্পের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্ক খুবই নিবিড়, তবে সুন্দর কী তা বিচার করা খুবই শক্ত, কারণ সাধারণের চোখে যা সুন্দর, শিল্পীর চোখে তা অসুন্দর ঠেকতে পারে, আবাব শিল্পীর চোখে যা সুন্দর, অন্যের চোখে হয়তো তাব কোন মূল্যই নেই। ছবি আঁকতে গেলে আবেগের যেমন প্রয়োজন আছে নির্জনতাও তেমনি কাম্য বলে শিল্পী মনে করেন।

অনীতা রায়চৌধুরী

ছবি আঁকার এবং শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখে অনেকেই। কিন্তু যে একাগ্রতা, অধ্যবসায় এবং প্রাণপ্রাচুর্য থাকলে শিল্পী হওয়া সম্ভব এবং জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করা যায় তা অনেকের মধ্যেই নেই। তাই ঘরে ঘরে জন্মায় না শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক। এর অন্য কারণও আছে। প্রথমেই সাধারণভাবে যে কথা শোনা যায়, তা হচ্ছে সঙ্গতির অভাব। অর্থাৎ রঙ ও তুলির খরচ জোগাবার মত সঙ্গতির অভাবে বহুজনেরই সে অভিপ্রায় অঙ্কুরেই লোপ পেয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হবার পর শিল্প ও শিল্পীদের প্রতি রাষ্ট্রকর্ণধারদের কথঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি পড়লেও জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে শিল্পীদের অবস্থার এমন কোন রূপান্তর ঘটেনি, যাতে করে প্রতিভাবান কোন শিল্পী মান বাঁচিয়ে চলার মত জীবনধারনের উপায় এই শিল্পের দ্বারা এখনও করতে সক্ষম। এ ছাড়া চিত্রণ ও ভাস্কর্য যতক্ষণ না পর্যন্ত রাষ্ট্রে ও সমাজে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটা আবশ্যিক অঙ্গে পরিণত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। শিল্পকে আপন পরিবেশে স্থান দেবার ক্ষমতা একমাত্র অর্থবল ও প্রাচুর্যে হয় না, মানুষের শিল্পসৃষ্টি ও শিল্পরাজি জন্মাবার ও বেড়ে উঠবার মত সভ্য আওতার যোগাযোগ থাকার একান্ত প্রয়োজনবোধেই তা সম্ভব। কারণ, শিল্প তো কারুর একার জন্যে নয়। সে বহুর। আমাদের মন দুনিয়াতে যা খুঁজে পায় না, যাতে তাঁর তৃপ্তি ঘটে নি, শিল্পী তাই রেশমী গুটির মত মনের তাঁতে বুনে চলে। সে ভ্রমরের মত পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে চলে যেতে চায়, সীমা হতে অসীমের পথে তার যাত্রা সুরু করে, সংসারের বহুমুখী সংস্পর্শতার ভেতর যে আন্দোলন তোলে, তাতে শিল্পী যে, তাঁর মন ভাল করে ভেজে না। কাজেই সংসারের এই বিচিত্র প্রবাহকে শিল্পী

আপন মনের রাজ্যে ভেঙ্গেচুরে অগ্রসর হয়। সীমাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে এরূপে চকিতে অসীমের বেলাভূমিতে পৌঁছিয়ে সে সান্ত্বনা পায় এবং নব পরিচয়ের উন্মুখ উত্তেজনায় সে মেতে ওঠে। একটা অভিনব রূপলাবণ্য নিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করে। কারণ, ললিতকলা হচ্ছে, বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে, মানুষের বাঁচবার জায়গা। মানুষ সেখানে এসে নিঃশ্বাস ফেলেছে—আরাম পেয়েছে। বন্ধনের নির্মম অন্ধকূপের ভিতর ললিতকলা যেন একটা গবাক্ষ পংক্তি। অসীমলোক হতে হাওয়া সেখানে পৌঁছায়—বিশ্বের পরিপূর্ণ তন্ত্রী হতে অখণ্ড রাগিণী সেখানে মানুষকে আরাম দেয়। শিল্পী সেখানে মহান জগতের জীব। তাই চাক্ষুষ পরিচয় মাত্রকেই তদ্বৎ করে আঁকলে যথার্থ শিল্পসৃষ্টি হয় না। বরং শিল্পীর মন যখন তার ইন্দ্রিয় বা তথ্যগুলিকে একটা আদর্শ অনুযায়ী করে গড়ে তোলে তখনই সে রচনা হয় পরিপূর্ণ। অবনীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, "শিল্প সৃষ্টি বহিঃপ্রকৃতির অনুকরণ নহে, সাধারণ দৃষ্টি দিয়া যাহাদের দেখি তাহাতে দ্রষ্টব্য বস্তুর সবটুকু সত্য দেখায় না; সত্যের যথার্থ উপলব্ধির জন্য অন্তর্দৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টি চাই এবং শিল্পী তাহা দিয়াই রসের সৃষ্টি করেন।" এবং সেই কারণেই শিল্পী অনীতা রায়চৌধুরী চোখে দেখা জগতের উপর রঙ ফলিয়ে কিছু করবার পক্ষপাতী নন। আবার বাস্তবকে বাদ দিয়ে অনাসৃষ্টি বা সৃষ্টিছাড়া কোন কিছু তাঁর রচনার মধ্যে স্থান পায়নি। ভাবুকের দৃষ্টির সঙ্গে কার্যকরী দৃষ্টিরও তিনি মিল ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ধ্যানরূপের সহিত কল্পরূপের সাদৃশ্য। তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারায় নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর ছবির মধ্যে বর্ণের বিন্যাস অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। রঙ সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকলে এমন বর্ণবিন্যাস সম্ভব নয়। তুলির উপর যথেষ্ট দখল এঁর আছে। ছবির টানটোনগুলি বেশ পরিণত। নির্দিষ্ট কোন ধারায় ইনি চলেন না। কল্পনা ছাড়া বাস্তব এবং বাস্তব ছাড়া কল্পনা যে কোন কাজে আসে না, সে কথা শিল্পী বেশ ভালভাবেই

বোঝেন। তাই নিরবিচ্ছিন্ন কল্পনার তিনি আশ্রয় নেননি। তাঁর রচনার টেকনিকও বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং তা রসসমৃদ্ধ। দুর্বোধ্য জটিল নক্সা বানিয়ে খুব উচ্চাঙ্গের চিত্রকরণের ভাণ এঁর রচনায় নেই। তাই ছবিগুলি সাধারণভাবে মনে লাগে। এই প্রসঙ্গে শিল্পী অনীতা আমাকে বললেন, "দেখুন, চিত্রের মধ্যে জটিলতা আমি পছন্দ করি না সত্যি কথা, তবে সাধারণের বোধগম্য না হলেই 'কী যে আজকাল আঁকে সব'…এ ধরণের উক্তিও শুনা যায়। তবে যাঁরা জানতে চান বা বুঝতে চান, তাঁদের কাছে বলে খুবই আনন্দ পাই এবং দর্শকেরাও ছবির অন্তর্নিহিত সুরটি ধরতে পেরে উৎফুল্ল হন। তাই দর্শকদের কাছে আমি অনুরোধ করি তাঁরা যেন আমার প্রদর্শনীতে এসে তাঁদের অবোধগম্য কিছু থাকলে নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে যেন বলেন। আমি সুখী হব তাতে।" রঙ সম্বন্ধেও শিল্পী বেশ সজাগ। প্রয়োজন-বোধে কখনও লাল, হলদে, সাদা বা অন্যান্য রঙের ব্যবহার তিনি করে থাকেন। সাধারণত রঙ হিসাবে তেলরঙটাকেই তিনি ব্যবহার করে থাকেন। আঙ্গিক ও বক্তব্যে আধুনিক হয়েও একজন শিল্পীর শিল্পকর্ম যে মনকে কতখানি দোলা দিতে পারে, কিছুদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত তাঁর ছবির একটি একক প্রদর্শনীই তার প্রমাণ।

পিতা অশ্বিনীকুমার ও মাতা সৌরেন্দ্রমোহিনী রায়চৌধুরীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান অনীতা হিন্দু গার্লস স্কুল থেকে ১৯৫৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর সরকারী চারু ও কলা মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং ১৯৬০ সালে সেখান থেকে সসম্মানে পাশ করে বেরিয়ে আসেন। এরপর কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি একাধিক জায়গায় তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিকায় তা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। বহু সম্মানপত্র এবং স্বর্ণপদকও তিনি অর্জন করেছেন। কিছুকাল পূর্বে যুব উৎসবে তাঁর একখানি ছবি বিচারকদের বিচারে প্রথম স্থান অধিকার করে। বর্তমানে শিল্পী অনীতা হাওড়া গার্লস স্কুলে শিল্পশিক্ষিকারূপে নিযুক্ত আছেন।

নীলিমা দত্ত

অনেকদিন আগেকার কথা। দিল্লীর ন্যাশানাল এক্‌জিবিসনে ছবির প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক শিল্পীব আঁকা ছবি এসেছে। দর্শকও বেশ হচ্ছে। কিন্তু ঘুরে ফিরে তাদের দৃষ্টি একজায়গাতে এসেই আটকে যাচ্ছে। দেওয়ালের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে ছবিটি। অনেকগুলো হাতী মিছিল করে চলেছে। আগে পিছে করে। তাদের পিঠের উপরে সুন্দর সাজপোশাকে মাহুতেরা বসে আছে। হাতীগুলোর চেহারা এবং সাজ সত্যিই মন কাড়াব মত। দর্শকেরা উচ্ছসিত প্রশংসা করে যাচ্ছে। শিল্পী কিন্তু নির্বিকার। অত্যুৎসাহী কয়েকজন দর্শক কিন্তু এরি মধ্যে শিল্পীর খোঁজ করে তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন। নির্বাচকমণ্ডলীও ভুল করলেন না। তাঁরা ঐ 'এ্যালিফ্যান্টস প্রসেশান' ছবিটিকেই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ ছবি বলে স্বীকৃতি দিলেন এবং শিল্পীকে নগদ দুশ টাকা দিয়ে সম্মান জানালেন। সেদিনের যে শিল্পীর প্রতি এতখানি সম্মান প্রদর্শিত হয়েছিল তিনি হচ্ছেন নীলিমা দত্ত। ভয় ভয় মনে কলকাতা থেকে দিল্লী গিয়েছিলেন, কিন্তু ফিরলেন অজস্র প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়ে।

নীলিমা দত্তের জন্ম কলকাতায় ১৯৩৪ সালে। পিতা ইন্দ্রচন্দ্র ও মা রায়কিশোরী দে'র তিনিই একমাত্র কন্যা। ভাইও আছে তিনটি। বাল্যকাল থেকেই নীলিমার ছবি আঁকার দিকে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। বাড়ীর পরিবেশটাও সেই সময়ে ছিল তাঁর পক্ষে অনুকূল। তাই ছবি আঁকার প্রথম পাঠ তাঁর শুরু হয় বাড়ীতেই। অবশ্য পড়াশুনাতে তার জন্য অবহেলা দেননি। আজকের যাঁরা প্রথম শ্রেণীব চিত্রকব তাঁদের মধ্যে অনেকেই তখন তাঁদের বাড়ী যাতায়াত করতেন। ১৯৪৭ সালে 'রূপযানী' নামে যে শিল্পী সংস্থা গড়ে উঠেছিল তাতে সভাপতিব